- ☑ জাতীয় শক্তি এবং এর উপাদানসমূহ
- ☑ শক্তির ভারসাম্য
- ☑ অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও নিরস্ত্রীকরণ
- ☑ ভূ-রাজনীতি
- ☑ বিশ্ব সন্ত্রাসবাদ
- ☑ জাতীয়তাবাদ
- ☑ সামাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ
- ☑ নব্য-উপনিবেশবাদ
- ☑ উত্তর আধুনিকতাবাদ
- ☑ বিশ্বায়ন

Syllablus on International Affairs

Section A: Conceptual Issues

- ☑ **Power and Security:** Power, national power, balance of power, disarmament, arms control, geopolitics, terrorism.
- ☑ **Major Ideas and Ideologies:** Nationalism, imperialism, colonialism, neo-colonialism, post-modernism, globalization and new world order.

BCS প্রশ্নাবলী আন্তর্জাতিক শক্তি, নিরাপত্তা ও মতবাদ

- ⇨ আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের গতিপ্রকৃতি উল্লেখ করুন। *(৪০তম বিসিএস)*
- ⇨ আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে ফাংশনালিজম (functionalism) তত্ত্বের গুরুত্ব কী? *(৪০তম বিসিএস)*
- ⇨ বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন। *(৪০তম বিসিএস)*
- ⇨ আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শক্তি বলতে কি বুঝায়? *(৩৮তম বিসিএস)*
- ⇨ অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক হুমকির মধ্যে পার্থক্য কি? *(৩৮তম বিসিএস)*
- ⇨ বৈশ্বিক সম্পদের (Global Commons) ধারণাটি কি? *(৩৮তম বিসিএস)*
- ⇨ আঞ্চলিক ও আঞ্চলিকীকরণের পার্থক্য কি? *(৩৭তম বিসিএস)*
- ⇨ Soft Power (শক্তি) বলতে কি বুঝায়? *(৩৭তম বিসিএস)*
- ⇨ সন্ত্রাসবিরোধী ইসলামি সামরিক জোট সম্পর্কে লিখুন। *(৩৬তম বিসিএস)*
- ⇨ Responsibility to Protect (R2P) কী? *(৩৬তম বিসিএস)*
- ⇨ বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ার মূল চালিকা শক্তিগুলো কী কী? *(৩৬তম বিসিএস)*
- ⇨ "ব্রেটন উড্স" (Bretton Wodds) প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন। *(৩৬তম বিসিএস)*
- ⇨ কপিরাইট (Copyright) কী? *(৩৬তম বিসিএস)*
- ⇨ ডব্লিউটিও (WTO) এর কার্যাবলি সংক্ষেপে লিখুন। *(৩৬তম বিসিএস)*
- ⇨ বিশ্বায়ন প্রক্রিয়ায় মূল চালিকাশক্তি (Driving Forces of globalization) গুলো কি? *(৩৫তম বিসিএস)*

- ⇨ ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্ট এর সজ্ঞা দিন। *(৩৫তম বিসিএস)*
- ⇨ ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র-এর বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখুন। *(৩৫তম বিসিএস)*
- ⇨ উপনিবেশবাদ এবং নব-উপনিবেশবাদ বলতে কি বুঝায়? উদাহরণসহ লিখুন। *(৩৪তম বিসিএস)*
- ⇨ বিশ্বায়ন (Globalization) (টীকা) *(৩৪তম বিসিএস)*
- ⇨ সন্ত্রাসবাদ কী? "মুসলিম বিশ্ব সন্ত্রাসের শিকার"- এ বক্তব্যের সাথে আপনি কি একমত? ব্যাখ্যা দিন। *(৩৪তম বিসিএস)*
- ⇨ জাতিগত সংঘাত বলতে কি বুঝায়? এই সংঘাত সৃষ্টির মূল কারণগুলো বর্ণনা করুন। *(৩৪তম বিসিএস)*
- ⇨ বিশ্বায়ন বলতে কী বুঝায়? বিশ্বায়নের বৈশিষ্ট ও সমস্যাসমূহ আলোচনা করুন। বিশ্বায়ন ও আঞ্চলিকতাবাদ কি একে অপরকে প্রতিদ্বন্দ্বী? *(৩০তম বিসিএস)*
- ⇨ বিশ্বায়ন সুযোগ (opportunities) এবং আশঙ্কার (Threats) সৃষ্টি করেছে। "দক্ষ জনগোষ্ঠীর জন্য রয়েছে সুযোগ সুবিধা এবং অদক্ষের জন্য আশঙ্কা"- এই মন্তব্যের সাথে আপনি কি একমত? আলোচনা করুন। *(২৯তম বিসিএস)*
- ⇨ বিশ্বায়ন প্রত্যয়টির আর্থ সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মাত্রাগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করুন। *(২৭তম বিসিএস)*
- ⇨ স্বল্পোন্নত দেশের বৈশিষ্ট্য কি? বিশ্বায়নের প্রেক্ষিতে এসব দেশের অবস্থার ব্যাখ্যা করুন। *(২৭তম বিসিএস)*
- ⇨ নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করুন। ইহা কতটুকু সত্য যে, নিরস্ত্রীকরণ বিশ্বশান্তির পূর্বশর্ত? *(২৭তম বিসিএস)*
- ⇨ বিশ্বায়নের উদ্ভব ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণপূর্বক দরিদ্র দেশ সমূহের ওপর এর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে মন্তব্য করুন। *(২৪তম বিসিএস)*
- ⇨ দক্ষিণ এশীয় পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক আগ্রহ সম্পর্কে একটি সমালোচনামূলক নিবন্ধ লিখুন। *(১৭তম বিসিএস)*

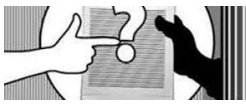

যেভাবে প্রশ্ন হতে পারে

১. জাতীয় শক্তি বলতে কী বোঝায়?
২. জাতীয় শক্তির বহি:প্রকাশ কিভাবে ঘটে?
৩. আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শক্তিসাম্যের সরূপ বিশ্লেষণ করুন।
৪. অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও নিরস্ত্রীকরণ বলতে কী বোঝায়?
৫. অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও নিরস্ত্রীকরণের মধ্যে পার্থক্য কী?
৬. ভূ-রাজনীতিতে ভৌগোলিক অবস্থানগত গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।
৭. আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের মূল কারণ কী?
৮. সামাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ কী?
৯. নব্য-উপনিবেশবাদের ধারণা বিশ্লেষণ করুন।
১০. উন্নয়নশীল / স্বল্পোন্নত দেশ সমূহে বিশ্বায়নের প্রভাব আলোচনা করুন।

আলোচ্য বিষয়

Power

শক্তি

বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বিভিন্নভাবে শক্তির সংজ্ঞা দিয়েছেন। অরগ্যানস্কি (Organski) এর মতে, "অন্যের আচরণ নিয়ন্ত্রণের সামর্থ্যই শক্তি বা ক্ষমতা" । পামার ও পারকিন্স এর মতে, "শক্তি বলতে এমন এক উপায়কে বুঝায়, যার দ্বারা কোনো কোনো রাষ্ট্র এর অভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক নীতিকে কার্যে প্রয়োগে করে।" ক্লেচার এর মতে, "কাউকে ভয় দেখিয়ে বা পুরস্কৃত করে কোনো কাজ করানো বা নিজের মতে আনার সামর্থ থাকাটাই হলো শক্তি।" শক্তির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে জর্জ সোয়জেনবার্গার তাঁর 'Power Politics' নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, "শক্তি হল একজনের ইচ্ছাকে অন্যের উপর চাপিয়ে দেবার ক্ষমতা এবং যদি তারা সেটা মানতে না চায় তখন তাদেরকে তা মানতে বাধ্য করার সামর্থ"।

শক্তি অনেকগুলো উপাদানের সমষ্টি। এদের মধ্যে কতকগুলো তুলনামূলকভাবে স্থায়ী আর বাকিগুলো প্রায়শ পরিবর্তনশীল। তবে শক্তি গঠনে এর প্রত্যেকটিই কমবেশি গুরুত্বপূর্ণ। শক্তির উপাদানগুলো নিম্নরূপ :

ক. তুলনামুলকভাবে স্থায়ী উপাদান

১. ভৌগোলিক অবস্থান
২. প্রাকৃতিক সম্পদ
৩. শিল্পসামর্থ
৪. সামরিক প্রস্তুতি
৫. জনসংখ্যা।

খ. অপেক্ষাকৃত অস্থায়ী উপাদান

১. জাতীয় চরিত্র ও মনোবল
২. সরকারের দক্ষতা
৩. কূটনৈতিক নৈপুণ্য।

আলোচ্য বিষয়

National Power

জাতীয় শক্তি

জাতীয় শক্তি হল জাতীয় স্বার্থের উৎকর্ষ সাধন ও তার উদ্দেশ্যাবলি বাস্তবায়নের জন্য একটি রাষ্ট্রের শক্তি ও সামর্থের যোগফল। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তিকে মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হিসেবে ধরা হয়। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বর্তমানে যে ক্ষমতার লড়াই চলছে, তার মূলে নিহিত আছে শক্তি। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটি জাতির অবস্থান কোথায় হবে এবং কে কী ভূমিকা পালন করবে, তা নির্ধারিত হয় ঐ জাতির শক্তির উপর। তাই Palmer and Perkins-এর International Relations গ্রন্থে বলা হয়েছে "National power is a vital and inseparable feature of the state-system"।

জাতীয় শক্তির উপাদানাসমূহ

ক. **কৌশলগত ভৌগোলিক অবস্থান :** জাতীয় শক্তির অন্যতম প্রধান উপাদান হলো ভূগোল, যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। Prof. Morganthau এর ভাষায়- "The most stable factor upon which the power of a nation depends is obviously geography"।

ভৌগোলিক অবস্থান নিম্নলিখিতভাবে একটি দেশের জাতীয় শক্তিকে প্রভাবিত করে-

১. **পরাশক্তির সমবর্তী, দূরবর্তী বা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অবস্থান :** কোন দেশের অবস্থান যদি সমসাময়িক বৃহৎ শক্তিগুলোর থেকে দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত হয় এবং সে তার নিজস্ব জাতীয় জীবন সহজে পরিচালনা করতে পারে (যেমন- নিউজিল্যান্ড, কোষ্টারিকা)। বিপরীতভাবে কোন দেশের অবস্থান যদি এমন হয় যে, সমসাময়িক বৃহৎ শক্তিগুলোর স্বার্থ সেখানে জড়িত, তবে তার সে অবস্থান পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা নীতিকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করবে (যেমন- জর্জিয়া)।

২. **সংঘর্ষ নিবারক রাষ্ট্র :** দুই বৃহৎ শক্তির মধ্যে অবস্থিত হওয়ায় কিছু দেশ অবাঞ্ছিত যুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছে অনেকবার (যেমন- বেলজিয়াম)। অন্যদিকে ভারত ও চীনের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় ভবিষ্যতে Buffer State হওয়ার সম্ভাবনা থেকে থাকবে নেপালের। বর্তমান সময়কার USA-এর ভারত প্রীতি এই সন্দেহের জন্ম দেয়।

৩. **স্থলবেষ্টিত দেশ :** ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য Land Locked দেশগুলোকে অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তারা সস্তা ও সুবিধাজনক জলপথ ব্যবহার করতে পারে না। কোন রাষ্ট্রীয় সমুদ্র না থাকায় তারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়। এসব দেশকে সবসময় অপর দেশের মুখাপেক্ষী হতে হয় (যেমন- আফগানিস্তান, নেপাল, জাম্বিয়া ইত্যাদি)।

৪. **সমুদ্রবেষ্টিত ও পর্বতবেষ্টিত দেশ :** কোনো দেশের অবস্থান যদি সমুদ্রবেষ্টিত হয় তবে তার জাতীয় শক্তি অনেকাংশে বৃদ্ধি পায় (যেমন- আমেরিকা, প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগর দ্বারা বেষ্টিত)। English Channel দ্বারা ইউরোপীয় ভূ-খণ্ড থেকে বিচ্ছিন্নতা ইংল্যান্ডের জাতীয় শক্তিকে বৃদ্ধি করেছে। অন্যদিকে আল্পস পর্বতদ্বারা বেষ্টিত ইতালির বিচ্ছিন্নতা তার জাতীয় শক্তিকে খর্ব করেছে।

খ. **দেশের আয়তন :** দেশের আয়তনের উপর জাতীয় শক্তি অনেকাংশে নির্ভর করে। সাধারণত বৃহৎ আয়তনের দেশ অধিক শক্তির অধিকারী হয়ে থাকে (যেমন- সোভিয়েত ইউনিয়ন ও USA)। নেপোলিয়ান ও হিটলার এর রাশিয়া অভিযান ব্যর্থ হওয়ার মূল কারণ রাশিয়ার আয়তন।

গ. **আকার ও আকৃতি :** আকার ও আকৃতি আরেকটি ভৌগোলিক দিক যার উপর জাতীয় শক্তি নির্ভর করে। সাধারণত একই আয়তন বিশিষ্ট Compact shape (আঁটসাঁট) দেশ Scattered shape (বিক্ষিপ্ত আকৃতির) দেশের চেয়ে অধিক সুবিধাজনক। কারণ- Compact shape-এর দেশের আন্তর্জাতিক সীমারেখা কম থাকে। অন্যদিকে Scattered shape-এর আন্তর্জাতিক সীমারেখা বেশি। এদের নিরাপত্তার জন্য বেশি চিন্তাভাবনা করতে হয়। যেমন : ফ্রান্স Compact shaped state যার রাজধানী মাঝখানে। জাতীয় শক্তি বৃদ্ধির জন্য আদর্শ রাষ্ট্রের উদাহরণ হতে পারে ফ্রান্স।

ঘ. **ভূ-প্রকৃতি :** ভূ-প্রকৃতি ভৌগোলিক উপাদানের মধ্যে অন্যতম। বন্ধুর ভূ-প্রকৃতি কোন দেশের অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ব্যবস্থায় বিঘ্নের সৃষ্টি করে। অন্যদিকে যে দেশ বিশাল বিস্তৃত ভূমির অধিকারী, সে দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার সুবিধার জন্য অতি সহজেই রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে ওঠে যা জাতীয় শক্তি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঙ. **জলবায়ু :** জলবায়ু জাতীয় শক্তিকে প্রভাবিত করে। কারণ জলবায়ুর উপর কোনো দেশের জনসাধারণের স্বাস্থ্য, শক্তি ও কর্মক্ষমতা নির্ভর করে। সাধারণত নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুই জনগণের মধ্যে অধিক কর্মক্ষমতা জুগিয়ে জাতীয় উন্নতিতে সহায়তা করে।

চ. **কূটনীতি ও নেতৃত্ব :** অস্থিতিশীল হলেও জাতীয় শক্তি গঠনে অন্যান্য উপাদানের মধ্যে কূটনীতিই গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পণ্ডিতগণ মনে করেন কূটনীতি হল জাতীয় ক্ষমতার মস্তিষ্কের মতো। মূলত কূটনীতি পররাষ্ট্র নীতির লক্ষ্য এবং মাধ্যমের সমন্বয় সাধনে সাহায্য করে একটি রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির আসনে উচ্চমর্যাদা ও উচ্চস্থান দান করে। মাও সে-তুং এবং চৌ এন লাইয়ের আমলে চীন তার ভাবমূর্তি গঠনের নীতি বুদ্ধিমত্তার সাথে পরিচালনা করে এবং তাদের কূটনৈতিক পারদর্শিতা চীনকে একটি বৃহৎ শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশে সাহায্য করে। অপরদিকে সফল কূটনীতির পাশাপাশি সফল নেতারও প্রয়োজন। দূরদর্শী নেতৃত্বের কারণে একজন নেতা সফলভাবে নিজ দেশকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তুলে ধরতে পারে এবং জাতীয় মর্যাদা বৃদ্ধির সাথে সাথে জাতীয় শক্তিও বৃদ্ধি করতে পারে (যেমন- মাহাথির মোহাম্মদের মালয়েশিয়া, হুগো শ্যাভেজের ভেনিজুয়েলা, মাহমুদ আহমাদিনেজাদের ইরান, ফিদেল ক্যাস্ট্রোর কিউবা)।

ছ. **জনসংখ্যা :** জাতীয় শক্তিতে জনসংখ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিদ্যমান। জাতীয় শক্তির যতগুলো উপাদান থাকা দরকার তাদের সব উপাদান যদি থাকে কিন্তু জনসংখ্যার যদি ঘাটতি থাকে তবে সে দেশের শক্তি বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা কম। কেবল জনসংখ্যা নয় জনগণের আর্থিক মান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, আধুনিক প্রযুক্তিগত দক্ষতা, উৎপাদন ক্ষমতা, অধ্যবসায়, শৃঙ্খলা ও অপেক্ষাকৃত তরুণ জনগোষ্ঠি জাতীয় শক্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করে (যেমন- চীন, জাপান, কোরিয়ার জনসমষ্টি)।

জ. **অন্যান্য যোগ্যতাসমূহ :**

১. **সামরিক ক্ষমতা :** যে কোনো দেশের সামরিক ক্ষমতাকে সে দেশের জাতীয় শক্তির অন্যতম উপাদান হিসাবে বিবেচনা করা হয়। বর্তমান বিশ্বে ৮ টি স্বীকৃত পারমাণবিক অস্ত্র সমৃদ্ধ দেশ রয়েছে। এই দেশগুলোর জাতীয় শক্তি বৃদ্ধিতে অবশ্যই Nuclear weapons সহায়তা করেছে। তাছাড়া সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে সামরিক ব্যয়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। USA-এর সামরিক ব্যয় অনেক বেশি। এজন্য USA একক পরাশক্তির ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে সেনাবাহিনীর সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। অতীতে একটি প্রবাদও ছিল, যেমন- "God in on the side of Biggest Battealion"। সেনাবাহিনীর দিক থেকে ভারত বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম শক্তিধর দেশ। এজন্য ভারত আঞ্চলিক পরাশক্তি হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছে।

২. **অর্থনৈতিক ক্ষমতা :** রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক শক্তির উপর জাতীয় শক্তি প্রত্যক্ষভাবে নির্ভরশীল। যে রাষ্ট্র অর্থনীতিতে শক্তিশালী সে দেশের অন্য উপাদানও শক্তিশালী। ফলে এ ধরণের রাষ্ট্রের জাতীয় শক্তি মজবুত হয় (যেমন- জাপান, EU-ভুক্ত দেশসমূহ)।

৩. **বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি :** শিক্ষা, তথ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি জাতীয় শক্তির পরিমাণ হিসাবে কাজ করে। শিক্ষা, তথ্য ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি দেশের সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা করে। তাই যে রাষ্ট্র শিক্ষা, তথ্য ও প্রযুক্তি বিদ্যায় যত অগ্রগামী সে রাষ্ট্র তত বেশি শক্তিশালী এবং তার জাতীয় শক্তি তত দৃঢ় মনোবল সম্পন্ন।

৪. **প্রাকৃতিক সম্পদ :** কোনো দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ দুর্বল হলে সেদেশের পক্ষে বৃহৎ শক্তিতে পরিণত হওয়া সম্ভব নয়। জাতীয় শক্তির উপাদান হিসাবে প্রাকৃতিক সম্পদকে দুইভাগে ভাগ করা যায়- ক. খাদ্য ও খ. কাঁচামাল। মূলত খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ নয় এমন দেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে দুর্বলতা থেকেই যায়। খাদ্য আমদানি করতে গিয়ে অনেক সময় বাধ্য হয়ে সরকারকে দেশের অনুকূল নয় এমন নীতিও গ্রহণ করতে হয়, যা তার জাতীয় শক্তি ক্ষুণ্ন করে।

৫. **শিল্প ক্ষমতা :** উন্নত শিল্প কাঠামো একটি দেশের জাতীয় শক্তি বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান উপকরণ। প্রাকৃতিক সম্পদ ও কাঁচামাল ব্যবহার করে দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য প্রয়োজন পুঁজি, কারিগরি দক্ষতা, সাংগঠনিক দক্ষতা, তথ্য ও প্রযুক্তি সম্পর্কে আধুনিক জ্ঞান। মধ্যপ্রাচ্যের তেল সমৃদ্ধ আরব দেশগুলো মাথাপিছু জাতীয় আয়ের ভিত্তিতে পৃথিবীতে প্রথম দিকের স্থানগুলো দখল করলেও শিল্প সামর্থ্যের অভাবে জাতীয় শক্তির দিক থেকে তাদের অবস্থান অনেক নিচে (বাংলাদেশ, কঙ্গো, জায়ারে- প্রভৃতি দেশ এর উদাহরণ)।

৬. **অভ্যন্তরীণ কাঠামো :** জাতীয় শক্তির ক্ষেত্রে অন্যতম উপাদান একটি দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কাঠামো। দেশ গণতান্ত্রিক হলে জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি পায়। অন্যদিকে স্বৈরতান্ত্রিক সরকার জনসমর্থন নিয়ে একটি দেশের নীতি নির্ধারণ করে না। জনগণের অসম্মতিতে কোনো নীতি গ্রহণ করলে সরকারের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন গড়ে ওঠে যা জাতীয় শক্তিকে মারাত্মকভাবে দুর্বল করে দেয়।

৭. **জাতীয় মূল্যবোধ :** একটি দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি, সামরিক শক্তি, অর্থনৈতিক সামর্থ্য অন্য দেশকে সাহায্য দেবার ক্ষমতা, জাতীয় সংস্কৃতি, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ইত্যাদি জাতীয় মর্যাদা বৃদ্ধি করে। ভারত-যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক সহযোগিতা চুক্তি ভারতের জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি করেছে। ভারত অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য পাচ্ছে যা তার অর্থনীতি ও সামরিক বাহিনীকে বিকশিত করছে। ফলে ভারত পরাশক্তি হিসাবে আবির্ভূত হচ্ছে।

৮. **খেলাধুলা ও সংস্কৃতি :** ক্রীড়া ও সংস্কৃতি অনেক সময় জাতীয় মর্যাদা বৃদ্ধি করে (যেমন- শ্রীলংকা)। যুদ্ধবিধ্বস্ত শ্রীলংকাকে ক্রিকেটের জন্য বিশ্বের অনেক দেশই চেনে। এছাড়া ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা, ইতালি বিশ্বে ফুটবলের জন্য ব্যাপকভাবে পরিচিত পেয়েছে।

৯. **নৈতিক শক্তি :** জাতীয় চরিত্র ও মনোবলের উপরও জাতীয় শক্তি অনেকটা নির্ভর করে। যেমন-

i. ইসলামের প্রাথমিক যুগে ঈমানের জোরে মুসলমানরা অনেক যুদ্ধে জয়ী হয়েছিল এবং অর্ধ-পৃথিবীব্যাপী ইসলামের বিজয় নিশান উড্ডীন ছিল।

ii. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মান বিমান বাহিনীর প্রবল আক্রমণ সত্ত্বেও ইংরেজদের জাতীয় মনোবলের দরুণই তারা টিকে থাকে।

iii. ফরাসিদের দৃঢ় মনোবলের অভাবে ম্যাজিনো লাইনের মত প্রায় দূর্ভেদ্য বাহু থাকা সত্ত্বেও তারা হিটলারের বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

iv. স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য ফিলিস্তিনিরা আজও অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করছে।

v. পারমাণবিক শক্তি বা অস্ত্রের প্রশ্নে ইরান যথাক্রমে USA, EU এবং IAEA-এর চোখ রাঙানি উপেক্ষা করে এখনও পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণে বদ্ধ পরিকর। এসবই মূলত ইরানের জাতীয় মনোবল ও দৃঢ়তার কারণে সম্ভব হয়েছে, যা বিশ্বে তার জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি করেছে।

জাতীয় শক্তির বহিঃপ্রকাশ

শক্তিই আন্তঃসম্পর্কের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়, কিন্তু পরিবর্তনশীল বিশ্ব শক্তিকে কেন্দ্র করে আরেক ধরণের শক্তির উদ্ভব ঘটেছে যেটা অর্থনৈতিক শক্তি নামে পরিচিত। মূলতঃ স্নায়ু যুগের পর এই তত্ত্বের ধারণা বিকশিত হয়েছে। বর্তমানে অর্থনৈতিক শক্তির উপর ভিত্তি করে জাতীয় শক্তি অনেকাংশে নির্ধারিত হয়ে থাকে। শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো এদের জাতীয় শক্তির পরিচয় দেয় "Sphere of Influence" এর মাধ্যমে। এ সকল বহিঃপ্রকাশ হলো-

১. **কূটনীতি :** স্নায়ু যুদ্ধোত্তর বিশ্বে USA একক পরাশক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয়। বিশ্বব্যাপী নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য USA ও এর মিত্ররা সম্প্রসারণবাদী পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করে। সাধারণত Capitalism কথিত গণতন্ত্র ও মানবাধিকার-এর দোহাই দিয়ে সমগ্র বিশ্বে এরা প্রভাব প্রতিপত্তি টিকিয়ে রেখেছে। 9/11 এর পরে USA ও এদের মিত্ররা তাদের পররাষ্ট্রনীতিতে 'সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধ' যুক্ত করেছে এবং সমগ্র মুসলমান বিশ্বকে প্রতিপক্ষ ভেবে তারা দখল করেছে আফগানিস্তান ও ইরাক। সাম্প্রতিক সময়ে রাশিয়া দক্ষিণ ওসেটিয়ায় তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য জর্জিয়ার সাথে যুদ্ধ করছে। USA ও এর মিত্ররা তৃতীয় বিশ্বের মুসলমান তথা দক্ষিণ এশিয়ার বাংলাদেশেও তাদের পররাষ্ট্রনীতির একই প্রয়োগ করছে। তেলসমৃদ্ধ তৃতীয় বিশ্বের অন্যান্য দেশেও মার্কিন মিত্ররা স্বার্থ সংরক্ষণে ব্যস্ত।

২. **বৈদেশিক সাহায্য :** জাতীয় শক্তি প্রদর্শনের সাময়িক অস্ত্রটি হলো বৈদেশিক সাহায্য। প্রথম বিশ্ব ও তাদের স্বার্থ সংরক্ষণকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে বৈদেশিক সাহায্য দিয়ে দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে। স্নায়ু যুদ্ধকালে পুঁজিবাদী বিশ্বের নেতাদের ন্যায় বর্তমানে তারা অর্থনৈতিক ক্ষমতা দ্বারা গোটা বিশ্বেরই নেতৃত্ব লাভ করেছে। বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি দেশ। বৈদেশিক সাহায্যের নির্ভরতার কারণে প্রথম বিশ্বের দেশসমূহ বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ব্যাপকভাবে হস্তক্ষেপ করছে।

৩. **সামরিক ভীতি প্রদর্শন :** বর্তমান সময়ের উন্নত তথা প্রথম বিশ্বের দেশসমূহ Military Deterrence এর মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ হাসিল করছে। পারমাণবিক অস্ত্র ইস্যুতে USA ও তার মিত্ররা ইরানের উপর ক্রমাগত ভীতি প্রদর্শন করে যাচ্ছে। এমনকি যুদ্ধেরও হুমকি দিচ্ছে। ইসরাইল অবশ্য এরই মধ্যে সামরিক মহড়াও দিয়ে ফেলেছে যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসাবে। সন্ত্রাস বিরোধী যুদ্ধের কৌশলগত মিত্র পাকিস্তানকেও দেয়া হচ্ছে Threat। নতুন সরকার এর উপর "Do more" চাপ বৃদ্ধিতে সেদেশের উপজাতীয় এলাকায় এরই মধ্যে USA ও NATO বাহিনী বোমা হামলা করেছে যা পাকিস্তানের সার্বভৌমত্বের প্রতি হুমকি স্বরূপ।

৪. **ব্যবসা-বাণিজ্য :** ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমেও উন্নত বিশ্ব তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। সাধারণত তৃতীয় বিশ্বে বহুজাতিক সংস্থাগুলো সংশ্লিষ্ট দেশের পক্ষে ব্যবসা পরিচালিত করে থাকে। অস্ত্র ব্যবসাও উন্নত বিশ্বের দেশগুলোর অর্থনীতিকে সচল করে রেখেছে। বৃহৎ অস্ত্র ব্যবসায়ী রাষ্ট্র হচ্ছে USA। সাধারণত তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহের স্বৈর-শাসকগণ তাদের অস্ত্রের প্রধান ক্রেতা। তাছাড়া, তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন বিদ্রোহী গ্রুপও তাদের প্রধান টার্গেট হয়ে থাকে। প্রকাশ্যে এবং অপ্রকাশ্যে অস্ত্র বিক্রি করে এসব দেশের উপর সরাসরি প্রভাব বিস্তার করে থাকে পরাশক্তিগুলো।

আলোচ্য বিষয়

Balance of Power

শক্তি সাম্য (Balance of Power) একটি দেশের কূটনীতির ক্ষেত্রে অনুসৃত কৌশলের ব্যাপার। একটি রাষ্ট্র যদি তার বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে এরূপ কৌশল অবলম্বন করে কিংবা করার চেষ্টা করে যাতে তার নিজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক শক্তিকে আর কোনো রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রগোষ্ঠী অনুরূপ শক্তি অতিক্রম করে যেতে না পারে তাহলে এই কৌশলকে শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখার কৌশল বলা হয়।

শক্তিসাম্য হলো স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে এমন এক ধরণের সাম্যাবস্থা যেখানে কোনো একক শক্তি অথবা কোনো শক্তির সমবায়কে এমন ক্ষমতাসম্পন্ন হতে না দেয়া যাতে অন্যদের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি হয়ে দাড়াতে পারে। অধ্যাপক সোর্জেনবার্গার এটাকে "সাম্যাবস্থা" অর্থাৎ আন্তর্জাতিক সম্পর্কে মোটামুটি স্থায়িত্ব বোঝাতে ব্যবহার করেছেন। কুইন্সি রাইট এর মতে, "শক্তিসাম্য হলো এমন একটি ব্যবস্থা, যেটি প্রতিটি রাষ্ট্রের মধ্যে এমন এক বিশ্বাস সৃষ্টি করে যে, কোন রাষ্ট্র আগ্রাসী হয়ে উঠলে তাকে অপরাজেয় জোটের সম্মুখীন হতে হবে।" শক্তিসাম্যের সবচেয়ে সুন্দর সংজ্ঞা দিয়েছেন অধ্যাপক ফে (Sidney B. Fay) তাঁর মতে, "শক্তিসাম্যের অর্থ হলো রাষ্ট্রীয় পরিবারের সদস্যদের মধ্যে শক্তির এমন একটি সঠিক সাম্যাবস্থা, যা কোন একটিকে বাঁধা দেবে এমন অধিক শক্তিশালী হতে যাতে সে অপরের উপর তার ইচ্ছাকে চাপিয়ে দিতে না পারে।" অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতশীতে শক্তিসাম্য নীতি জনপ্রিয় ছিল। শক্তিসাম্যকে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা সৃষ্টিতে একটা অপরিহার্য উপাদান মনে করা হতো। কোন একটি রাষ্ট্র অধিক শক্তি সঞ্চয় করে ফেললে অন্য রাষ্ট্রগুলো নানা কৌশল অবলম্বন করে তার সমকক্ষ হওয়ার চেষ্টা করত। যার ফলে বাড়তি শক্তি সঞ্চয়কারী রাষ্ট্র শক্তিশালী হওয়ার ইচ্ছা ত্যাগ করতে বাধ্য হতো। এভাবেই শক্তিসাম্য শান্তি ও নিরাপত্তা স্থাপন করত । কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়া ভাঙ্গার ফলে তা বিনষ্ট হয় ।

উনবিংশ শতকের শেষার্ধ থেকে প্রথম মহাযুদ্ধ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার ইউরোপের ক্ষেত্রে এই কূটনীতিক কৌশল অনুসরণ করে চলছিল। ইউরোপে তখন একদিকে ছিল জার্মানি, অষ্ট্রিয়া এবং ইতালির ত্রয়ী-জোট এবং অপর দিকে ছিল ইংরেজ, ফরাসি এবং রাশিয়ার ত্রয়ীজোটের শক্তি। এই দুই জোটের পারস্পারিক লক্ষ্য ছিল যেন প্রতিপক্ষ তাকে অতিক্রম করে যেতে না পারে। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপে জার্মানি যখন ক্রমান্বয়ে পররাজ্য গ্রাস করে নিজ পক্ষের শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকে তখন ইংল্যান্ড তার পাল্টা কোনো ব্যবস্থা গ্রহণে অক্ষম হয়। এই পর্যায়ে ব্রিটিশ সরকার নাজিবাদী জার্মানির প্রতি তোষণনীতি অবলম্বন করে।

বস্তুত প্রথম মহাযুদ্ধের পরে ১৯১৭ সালের রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধমে রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকল্প হিসাবে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা পুরাতন ভারসাম্য ব্যবস্থাকে ধনবাদী যে কোন রাষ্ট্রের নিকট অপ্রয়োজনীয় এবং অকেজো করে তোলে। তখন থেকে ধনবাদী এবং সমাজতন্ত্রী শক্তির মধ্যে ভারসাম্যের প্রশ্নটির সূচনা হয়। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত পুঁজিবাদী ও ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রসমূহের বিশ্বাস ছিল যে, সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থা ও শক্তি দীর্ঘজীবি হবে না। তারা সমাজতান্ত্রিক শক্তিকে ধ্বংস করতে পারবে। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত রাশিয়ার বিস্ময়কর বিজয়, অধিকতর দেশসমূহের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হওয়া এবং জার্মানির মতো দুর্ধর্ষ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের পরাজয় এই বিশ্বাসকে ভিত্তিহীন প্রমাণ করে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহের প্রধান শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমাজতন্ত্রকে প্রধান প্রতিপক্ষ বলে গণ্য করে তার সঙ্গে শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখার নীতি অনুসরণ করতে থাকে। বর্তমানে শক্তির ভারসাম্য বলতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার পারস্পরিক শক্তির সমতা বুঝায়। যদিও নব্বই-এর দশকের গোড়াতে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার পতনের পর আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একক প্রাধান্য সৃষ্টির পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে এবং এই পরিস্থিতি সিরীয় গৃহযুদ্ধের আগে পর্যন্ত বলবত থাকে।

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শক্তিসাম্যের সরূপ বিশ্লেষণ

আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শক্তিসাম্য একটি বহুমুখী ধারণা। সমগ্র বিশ্বরাজনীতিকে স্থিতিশীল রাখার জন্য এটা বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্নভাবে ক্রিয়াশীল। নিম্নে এ বিষয়ে আলোচনা করা হলো-

ক. **ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে শক্তিসাম্য নীতি :** স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিবেশি দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে কার্যকর শক্তিসাম্য বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে লক্ষ্য করা যায় (যেমন- ইসরাইল ও আরববিশ্বের ক্ষমতার ভারসাম্য, যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সের ক্ষমতার ভারসাম্য ইত্যাদি)। তবে স্নায়ু যুদ্ধোত্তর যুগে শক্তিসাম্য তত্ত্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো ১৯৯৮ সালে ভারতের পারমাণবিক বিস্ফোরণের জবাবে পাকিস্তানের পারমাণবিক বিস্ফোরণ।

খ. **আঞ্চলিক পর্যায়ে শক্তিসাম্য নীতি :** ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা দেখতে পাই যে, বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত শক্তিসাম্যের নীতি মূলত ইউরোপের শক্তিগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ইউরোপের কোন রাষ্ট্র যাতে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে অন্য বা অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব ধ্বংস করতে না পারে সেদিকেই লক্ষ্য রেখে সাম্যের এই নীতি গড়ে উঠেছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে আমরা এই ধারণাটি লক্ষ্য করি দক্ষিণ-দক্ষিণপূর্ব এশিয়া, ইন্দো-চীন, মধ্যপ্রাচ্য, ল্যাটিন আমেরিকায়। আর এভাবেই শক্তিসাম্য তত্ত্বটি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়।

গ. **মহাদেশীয় শক্তিসাম্য :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময় ও স্নায়ু যুদ্ধের সময় ইউরোপের পূর্ব প্রান্তের সমাজতান্ত্রিক শিবিরের সাথে পশ্চিম ইউরোপের পুঁজিবাদী রাষ্ট্রসমূহের বিরোধের মধ্যদিয়ে মহাদেশীয় শক্তিসাম্যের দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে ইউরোপের উভয় অংশই আদর্শিক কারণে পরস্পরবিরোধী জোটভুক্ত হয় এবং ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা চালায়।

ঘ. **আন্তঃমহাদেশীয় শক্তিসাম্য :** বর্তমান বিশ্বে যদিও শক্তিসাম্য নীতির পূর্বের গুরুত্ব হ্রাস পেয়েছে তথাপি দেখা যায় বিশ্বের একক পরাশক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপরীতে এশিয়ায় চীন, ইউরোপে কখনো রাশিয়া, কখনো ফ্রান্স-জার্মানির প্রতিরোধ আমাদের কাছে শক্তিসাম্য বলে মনে হয়। তাছাড়া মহাদেশভিত্তিক অর্থনৈতিক জোটগুলোর মধ্যেকার প্রতিযোগিতাও এই নীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ঙ. **বিশ্বব্যাপী শক্তিসাম্য নীতি :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শক্তির ভারসাম্যের রাজনীতি পৃথিবীব্যাপী ব্যাপকভাবে আলোচিত ও পরিলক্ষিত হয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে মহাশক্তিধর ও ভারসাম্য রক্ষাকারী রাষ্ট্ররূপে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্ভব এবং পরবর্তীকালে এশিয়া-আফ্রিকার বহু অঞ্চলে পরাধীন দেশগুলো স্বাধীনতা লাভের ফলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একচ্ছত্র আধিপত্য হ্রাস পায়। এসব কারণেই শক্তিসাম্যের ধারণা বর্তমানে বিশ্বব্যাপী ধারণায় পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন বিশ্লেষক-গবেষক মনে করেন যে, বিশ্বব্যাপী শক্তিসাম্যের ক্ষেত্রে কোন ভারসাম্যের অভাব দেখা দিলে স্থানীয়, আঞ্চলিক, মহাদেশীয় কিংবা আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষমতার ভারসাম্য দ্বারা ঐ অভাব পূরণ করা সম্ভব।

শক্তিসাম্য বজায় রাখার কৌশলসমূহ

১. **মৈত্রীজোট :** শক্তিসাম্য রক্ষার্থে নিজ নিজ স্বার্থ বৃদ্ধির জন্য দুই বা ততোধিক দেশের সংঘবদ্ধ হওয়াকে মৈত্রীজোট বলা হয়। এটা শক্তিসাম্য রক্ষার একটি অন্যতম প্রধান কৌশল। Prof. Morganthau বলেন, "Alliances are a necessary function for the balance of power operating within a multistate system."

২. **অস্ত্রীকরণ ও নিরস্ত্রীকরণ :** শক্তিসাম্য বজায় রাখার অন্যতম উপায় হচ্ছে যে, যখনই কোনো একটি রাষ্ট্র শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকে তখনই তার বিরোধীরা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হতে থাকে। এর ফলে যে রাষ্ট্রটি শক্তি বৃদ্ধিতে জোর দিয়েছিল সে তা হতে নিবৃত্ত থাকবে। এতে করে বিরোধীরা অস্ত্রশস্ত্রের দিকে ঝুঁকবেনা এবং শক্তিসাম্য প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু বাস্তবে তা প্রায়ই অমান্য করা হয়।

৩. **ক্ষতিপূরণ :** আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ক্ষতিপূরণ বলতে এমন একটি ব্যবস্থা বোঝায়, যা দ্বারা কোনো রাষ্ট্র রাজ্যজয়ের মাধ্যমে শক্তি বৃদ্ধি করলে অন্য রাষ্ট্রের সাথে উক্ত রাষ্ট্রের শক্তির যে ভারসাম্যহীনতা দেখা দেয় তাকে সংশোধন করার জন্য অপর রাষ্ট্র কর্তৃক আরেকটি রাজ্য অথবা প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের দ্বারা দখলীকৃত রাজ্যটির অংশবিশেষ জয়ের মাধ্যমে শক্তির সাম্য পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা হয়। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে শক্তিসাম্য বজায় রাখার ব্যাপারে এ নীতিটি বহুল প্রচলিত ছিল।

৪. **সংঘর্ষ নিবারক রাষ্ট্র :** দুটি বৃহৎ অথচ বিপরীতমনা রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থানের মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত কোনো ক্ষুদ্র রাষ্ট্র যা উভয়ের মধ্যে সরাসরি সংঘর্ষকে বাধাদান করে, তাকেই সংঘর্ষ নিবারক অথবা Buffer State বলে। উদাহরণস্বরূপ আমরা দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যবর্তী এলাকায় অবস্থিত বেলজিয়ামের কথা উল্লেখ করতে পারি। বিভিন্ন বৃহৎ শক্তির মধ্যবর্তী এই ধরণের ক্ষুদ্র রাষ্ট্র তাদের মধ্যে শক্তিসাম্য রক্ষায় বিরাট ভূমিকা পালন করে। তাই এ ধরনের রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

৫. **হস্তক্ষেপ :** শক্তিসাম্য বজায় রাখার আর একটি পদ্ধতি হল এক রাষ্ট্র কর্তৃক তার নিজস্ব শক্তিসাম্যের স্বার্থে অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা। এ হস্তক্ষেপ সাধারণত অপেক্ষাকৃত অধিক শক্তিশালী রাষ্ট্র কর্তৃক কম শক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্রের উপর ঘটে থাকে।

৬. **বিভক্তিকরণ ও শাসন :** শক্তিসাম্য বজায় রাখার আর একটি কৌশল হল বিভক্তিকরণ ও শাসন। এ নীতির মাধ্যমে কোনো রাষ্ট্র বা জোট অধিক শক্তিশালী হলে তার প্রতিপক্ষ বন্ধুরাষ্ট্র ঐ অধিক শক্তিশালী রাষ্ট্রটি থেকে দূরে সরিয়ে এনে অথবা বিচ্ছিন্ন করে সাম্যাবস্থা বজায় রাখার প্রচেষ্টা চালায়।

শক্তির ভারসাম্য তত্ত্বের গুরুত্ব ও বর্তমান প্রেক্ষাপট

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে শক্তির ভারসাম্য তত্ত্বটি ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত ব্যবস্থা। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত শক্তির ভারসাম্য যথেষ্ট জনপ্রিয় ছিল। তখন এ তত্ত্ব বিশ্বশান্তি রক্ষার ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হত। কিন্তু কালের বিবর্তনের ফলে জাতিসংঘের মত সর্বজনস্বীকৃত সংস্থাসহ বিভিন্ন সংস্থা গড়ে ওঠার ফলে বর্তমানে শক্তির ভারসাম্য তত্ত্বের গুরুত্ব পূর্বের তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। বিশ্ব জনমত আজ এ তত্ত্বের যৌক্তিকতা ও অসারতা নিয়ে নতুন করে ভাবতে শুরু করেছে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো-

১. **বিশ্বসংস্থা 'জাতিসংঘের' উদ্ভব :** দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব রাজনীতিতে আবির্ভাব ঘটে জাতিসংঘ নামক আন্তর্জাতিক সংস্থার, যা বর্তমানকাল পর্যন্ত সর্বজনস্বীকৃত বিশ্বসংস্থা। এই সংস্থার উদ্ভবের ফলে বিশ্বরাজনীতিতে একটি নতুন ধারার সূচনা হয়। ফলে শক্তির ভারসাম্য নীতির কার্যকারিতা পূর্বের তুলনায় হ্রাস পায়। জাতিসংঘ কর্তৃক 'যৌথ নিরাপত্তা' ব্যবস্থা ও সকল দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নীতির ফলেও এই তত্ত্ব বর্তমানে গুরুত্ব হারাচ্ছে।

২. **জাতীয়তাবাদী ধারণার অবসান :** জাতীয়তাবাদী ধারণার সঙ্গে শক্তির ভারসাম্য ধারণাটিও জড়িত। জাতীয়তাবাদ ও সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ন রাখার জন্য রাষ্ট্রসমূহ বিভিন্ন মৈত্রীজোট ও প্রতি মৈত্রীজোটে অংশগ্রহণ করত এবং এভাবেই শক্তি ভারসাম্য রক্ষা হত। কিন্তু বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও সার্বভৌমত্বের ধারণা ম্লান হতে চলেছে। বিশ্বব্যাপী চলছে বিশ্বায়নের ধারণা। তাই মানুষ এখন ক্ষুদ্র গণ্ডি পেরিয়ে আন্তর্জাতিকতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। ফলে আঞ্চলিক শক্তির ভারসাম্য ধারণা হ্রাস পেতে চলেছে।

৩. **আন্তর্জাতিক রাজনীতির নতুন মেরুকরণ :** ষোড়শ শতাব্দী থেকে শুরু করে স্নায়ু যুদ্ধের সময় পর্যন্ত আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে দ্বি-মেরুবাদের ভিত্তিতে শক্তির ভারসাম্য রক্ষিত হয়ে আসছিল। স্নায়ু যুদ্ধের সময় এবং বিশেষ করে এরপর বিশ্বের রাজনীতির নতুন মেরুকরণ ঘটেছে। জাতিসংঘের মত আন্তর্জাতিক সংস্থা গড়ে উঠেছে। দ্বিমেরুবাদের অবসানের পর বিশ্বব্যবস্থায় কার্যত বহুমেরু প্রকৃতির শক্তির উদ্ভব ঘটেছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতির নতুন ও পরিবর্তিত এ মেরুকরণ শক্তির ভারসাম্য তত্ত্বকে অনেকটাই অকার্যকর করেছে।

৪. **নতুন আন্তর্জাতিক আইন :** বহু মেরুকেন্দ্রিক আন্তর্জাতিক রাজনীতির পাশাপাশি আন্তর্জাতিক আইনের উৎকর্ষ কিছুটা হলেও সাধিত হয়েছে। বিশ্বের মানুষ আজ জাতীয়তার বেড়াজাল ছিন্ন করে আন্তর্জাতিকতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। আঞ্চলিকতা তথা জোট ও প্রতিজোট রক্ষার স্বার্থে যে সকল আইন প্রচলিত ছিল, বর্তমানকালে তা পরিবর্তিত হয়ে একক বিশ্বব্যবস্থার উপযোগী হয়ে উঠেছে। এই একক বিশ্বব্যবস্থার জন্যই নতুন আন্তর্জাতিক আইন তৈরি হচ্ছে। ফলে আন্তর্জাতিক আইনের এ বাস্তবতা শক্তির ভারসাম্যের ধারণাটিকে অনেকটাই নিষ্প্রভ করেছে।

৫. **জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন :** জোটনিরপেক্ষ আন্দোলন শক্তির ভারসাম্য নীতির বিরোধী। এই আন্দোলনের শুরু হয় মূলত স্নায়ু যুদ্ধের সময় হতে। শক্তির ভারসাম্য রক্ষার স্বার্থে তখন রাষ্ট্রসমূহ হয় সমাজতান্ত্রিক না হয় পুঁজিবাদী শিবিরে যোগদান করত। সাধারণত নিজেদের পক্ষে দর কষাকষি করে লাভজনক শিবিরে যোগদান করত। আর এ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হলো কোনো জোট বা শক্তির অন্তর্ভুক্ত না হয়ে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নীতিতে অটল থাকা। স্নায়ু যুদ্ধের অবসানের পর তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো আজ নিজস্ব স্বতন্ত্র স্বাধীনতা নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। আর এই বাস্তবতাই শক্তির ভারসাম্য তত্ত্বের গুরুত্ব দিন দিন কমিয়ে দিচ্ছে।

৬. **শক্তি পরিমাপের অসুবিধা :** শক্তি একটি পরিবর্তনশীল প্রত্যয়। এ প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। এ অবস্থায় রাষ্ট্রীয় শক্তির পরিমাপ অনুমান করা কষ্টকর বিষয়। আর সে কারণেই একটি রাষ্ট্র শক্তিসাম্য অর্জন করেছে কিনা তাও পরিমাপ করা যায় না।

৭. **স্বনির্ভরতা অর্জন :** বিশ্বের প্রত্যেকটি স্বাধীন রাষ্ট্র চায় স্বনির্ভরতা অর্জন করতে। বিশেষ করে এই স্বনির্ভরতা অর্জনের মূল লক্ষ্য থাকে নিজের বা নিজেদের শক্তি অর্জনের মাধ্যমে বিভিন্ন ধ্বংসাত্মক মারণাস্ত্র সংরক্ষণ। আর এজন্য বিশ্বের বহু রাষ্ট্রই বর্তমানে পারমাণবিক অস্ত্র তৈরির কৌশলগুলো আয়ত্তে এনেছে। তাই বর্তমানে রাষ্ট্রগুলো ক্ষমতা খর্ব করে সাম্য আনার ব্যাপারে তেমন আগ্রহী নয় এবং দিন দিন এর ফলে শক্তির ভারসাম্য তত্ত্বটি গুরুত্ব হারাচ্ছে।

৮. **আদর্শগত দ্বন্দ্ব :** বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো আদর্শগত দ্বন্দ্ব। অতীতে আমরা দেখতে পাই আন্তর্জাতিক রাজনীতি জাতীয়তাবাদী চেতনা দ্বারা পরিচালিত হত। কিন্তু বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আদর্শগত উপাদান এতই শক্তিশালী হয়ে উঠেছে যে, আদর্শগত দ্বন্দ্ব আজ জাতীয়তাবাদের স্থান দখল করে নিয়েছে। আর আদর্শবাদী জাতিগুলোই আজ বিশ্বে নেতৃত্ব দিচ্ছে। কাজেই এর ফলে শক্তির ভারসাম্যের গুরুত্ব অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।

৯. **বিশ্ব জনমতের প্রভাব :** বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় 'বিশ্ব জনমত' একটি শক্তিশালী উপাদান। আধুনিককালে কোন রাষ্ট্রই বিশ্ব জনমতকে উপেক্ষা করে আগ্রাসী ভূমিকা পালন করতে পারে না। পর পর দুটি বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা ও বড় যুদ্ধ প্রত্যক্ষ করে এখন বিশ্বের প্রতিটি মানুষই যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কে রীতিমত আতঙ্কগ্রস্ত। তাই দেখা যায় কোনো রাষ্ট্র যদি আগ্রাসী হতে চায় তাহলে তাকে নিজ দেশ ও বিশ্বের অন্যান্য দেশের প্রতিকূল জনমতের সম্মুখীন হতে হয়। এই কারণেও এই তত্ত্বটির গুরুত্ব হ্রাস পাচ্ছে।

১০. **অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব :** বর্তমান বিশ্বে চলছে Globalization-এর যুগ। এর মূল লক্ষ্য হলো এক বিশ্বগ্রাম প্রতিষ্ঠা করা এবং এর মূল চালিকাশক্তি হলো অর্থনীতি। বর্তমান আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অস্ত্র প্রতিযোগিতা পূর্বের তুলনায় অনেক হ্রাস পেয়েছে। অর্থতৈনিক শক্তি সেই স্থান দখল করে নিয়েছে। তাই বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো সামরিক প্রতিযোগিতার পথ ছেড়ে অর্থনৈতিক প্রাধান্য বিস্তারের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এখন বৃহৎ শক্তিগুলোর লক্ষ্য হলো শিল্পক্ষেত্রে জাপানসহ অগ্রসরমাণ দেশগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা। তাই অর্থনৈতিক প্রাধান্যের ক্ষেত্রে শক্তির ভারসাম্যকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

সুপ্রাচীনকাল থেকেই বিশ্বশান্তি ও স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য শক্তির ভারসাম্যকে একটি ইতিবাচক উপায় হিসেবেই বিবেচনা করা হচ্ছে। তবে সময়ের পরিবর্তনে এর প্রকৃতিতেও পরিবর্তন সূচিত হয়। বর্তমানে মনে করা হয়, বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে অর্থনৈতিক জোট বা রাষ্ট্রীয় শক্তিশালী অর্থনীতির মাধ্যমেই অপর রাষ্ট্র বা জোটের কর্তৃত্বকে নিয়ন্ত্রণ করা হবে এবং অর্থনীতিই সৃষ্টি করবে শক্তির ভারসাম্য।

আলোচ্য বিষয়

Armament and Disarmament : Treaties Relating to Arms Control

অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও নিরস্ত্রীকরণ

অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ (Arms Control) : নিরস্ত্রীকরণের আধুনিক সংস্করণ হলো অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ। অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বলতে বোঝায় যে, অস্ত্রশস্ত্র থাকতে পারে কিন্তু এগুলো নিয়ন্ত্রণের অধীনে আসবে। ১৯৬৩ সালের ৫ আগস্ট মস্কোতে পারমাণবিক পরীক্ষা বন্ধের চুক্তিতে স্বাক্ষরই প্রথম আশাব্যঞ্জক হলো অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত চুক্তি।

নিরস্ত্রীকরণ : আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নিরস্ত্রীকরণ হলো কোনো রাষ্ট্রের স্বেচ্ছায় অস্ত্র উৎপাদন হ্রাস করা, অথবা দুই বা ততোধিক রাষ্ট্র নিজেদের মধ্যে আলোচনা সাপেক্ষে অস্ত্র উৎপাদন হ্রাস করা। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলো- সৈন্য সংখ্যা কমানো, অস্ত্রের সংখ্যা কমানো, নতুন অস্ত্র উৎপাদন না করা, অস্ত্রের গুণগত মান বৃদ্ধি না করা, অস্ত্র প্রতিযোগিতামূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণ না করা, সামরিক খাতে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ না দেওয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

অন্য কথায় নিরস্ত্রীকরণ বলতে বোঝায় মারণাস্ত্রের প্রতিযোগিতা বন্ধ করার জন্য কোন নির্দিষ্ট ধরণের বা সকল ধরণের অস্ত্র হ্রাস করা, উৎপাদিত অস্ত্র ধ্বংস করা বা উৎপাদন বন্ধ করা। নিরস্ত্রীকরণ চার ধরনের হতে পারে। ১. সাধারণ নিরস্ত্রীকরণ, ২. আঞ্চলিক বা স্থানীয় নিরস্ত্রীকরণ, ৩. সংখ্যাগত নিরস্ত্রীকরণ ও ৪. গুণগত নিরস্ত্রীকরণ।

অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ ও নিরস্ত্রীকরণের পার্থক্য

নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ প্রায়ই সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু যদিও তাদের মূল উদ্দেশ্য একই; অর্থাৎ যুদ্ধের সম্ভাবনাকে কমিয়ে, নিয়ন্ত্রিত করে এবং সম্ভব হলে সম্পূর্ণরূপে দূর করে ক্ষয়ক্ষতি রোধ করা । তবুও তাদের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। এ পার্থক্যটি প্রকৃতিগত নয়, শুধু পরিমাণগত। নিচে ধারাবাহিকভাবে নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের পার্থক্যগুলো উপস্থাপন করা হলো :

১. নিরস্ত্রীকরণ অস্ত্রশস্ত্রকে বর্জন করতে অথবা হ্রাস করতে প্রস্তাব দেয়; অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ প্রস্তাব দেয় অস্ত্রশস্ত্র থাকতে পারে কিন্তু এগুলো নিয়ন্ত্রণের অধীনে আসবে।

২. নিরস্ত্রীকরণ হলো সনাতন ধারণা, কিন্তু জাতিসমূহ যখন নিরস্ত্রীকরণে সম্মত না হয় অর্থাৎ তারা অস্ত্রশস্ত্র বিলোপ অথবা হ্রাস না করে তখন তারা এ সমস্যাটি মোকাবিলা করার জন্য নতুন একটি পদ্ধতি অবলম্বন করে- তা হলো অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ। যাকে নিরস্ত্রীকরণের আধুনিক সংস্করণ বলা যেতে পারে।

৩. নিরস্ত্রীকরণকে ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করলে কেবল অস্ত্রের পরিমাণ হ্রাস বা বিলোপ সাধনকেই বোঝায় না, সেনাবাহিনীর সংখ্যা হ্রাসকেও বোঝায়। অপরদিকে, অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বলতে চুক্তি বা সমঝোতার ভিত্তিতে প্রদত্ত নির্দিষ্ট বা পরিমাণগতভাবে অস্ত্র উৎপাদন করাকে বোঝায়।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এ কথা সুস্পষ্ট যে, নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ বলতে চুক্তি বা সমঝোতার ভিত্তিতে প্রদত্ত নির্দিষ্ট বা পরিমাণগতভাবে অস্ত্র উৎপাদন করাকে বোঝায়।

নিরস্ত্রীকরণের গুরুত্ব

ক. **বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা :** বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার জন্য নিরস্ত্রীকরণ অত্যাবশ্যক। অতীত ইতিহাস থেকে দেখা যায় যে, মারণাস্ত্রের বিপুল সম্ভারই প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধসহ সকল বড় বড় যুদ্ধের কারণ। তাই নিরস্ত্রীকরণ তথা অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে পৃথিবীতে যুদ্ধসহ গোলযোগ হ্রাস পাবে এবং বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা ফিরে আসবে।

খ. **আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নে :** নিরস্ত্রীকরণ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উন্নতি সাধনে সাহায্য করে। নিরস্ত্রীকরণের মাধ্যমে পূর্ব পশ্চিমের অস্ত্রের প্রতিযোগিতা বন্ধ করলে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার অগ্রগতি ঘটবে, উত্তেজনা হ্রাস পাবে এবং দীর্ঘকালীন রাজনৈতিক সমস্যাসমূহের সমাধান সম্ভব হবে।

গ. **উন্নয়নশীল দেশের অর্থনৈতিক বিকাশে :** বৃহৎ পরাশক্তিসহ অনেক উন্নয়নশীল দেশ তাদের বাজেটে একটা বিরাট অংশ অস্ত্র তৈরি ও সংগ্রহ এবং সামরিক শক্তি বৃদ্ধির কাজে ব্যয় করছে ফলে অনেক উন্নয়ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন ব্যহত হচ্ছে। আবার দেখা যায়, পরাশক্তিসমূহ সামরিক খাতে যে বিশাল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে তার একটা নির্দিষ্ট অংশ কমিয়ে উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশগুলোকে দিলে তাদের দারিদ্র্যের হার অনেকটা লাঘব হতো। তাই সামরিক বাজেট হ্রাস করে দরিদ্র দেশগুলোকে সাহায্য প্রদান ও তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নিরস্ত্রীকরণ প্রয়োজন।

ঘ. **পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধ :** পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধের জন্যও নিরস্ত্রীকরণ প্রয়োজন। আণবিক মরণাস্ত্র পরীক্ষা পরিবেশকে দূষিত করে। সমুদ্রতল, ভূ-ভাগ, মরুভূমি এবং বায়ুমণ্ডল যেখানেই আণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো হোক না কেন, পরিবেশ দূষিত হতে বাধ্য। এর ফলে সমুদ্রের মাছসহ বিভিন্ন প্রাণি বিলুপ্ত হয়, বায়ুমণ্ডল দূষিত হয়ে মানুষের নানাবিধ রোগের সৃষ্টি করে। কাজেই পরিবেশকে বাঁচাতে নিরস্ত্রীকরণ প্রয়োজন।

ঙ. **প্রয়োজনীয় সম্পদের অপব্যবহার রোধে :** মানবিক এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার রোধের জন্য নিরস্ত্রীকরণ প্রয়োজন। বিশ্বব্যাপী মারণাস্ত্র উৎপাদনের জন্য বিপুল অর্থ ব্যয় হয়। নিরস্ত্রীকরণের ফলে ঐসব সম্পদ মানবজাতির স্থায়ী কল্যাণের জন্য ব্যবহার করা সম্ভব হবে।

চ. **যুদ্ধের সম্ভাবনা হ্রাস করা :** নতুন নতুন মারণাস্ত্রের উদ্ভাবন ও এর মজুত গড়ে তোলার ফলে বিশ্বে সামরিক উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়- যার পরিণতি হচ্ছে যুদ্ধবিগ্রহ। নিরস্ত্রীকরণ যুদ্ধের ও আন্তর্জাতিক উত্তেজনা সম্পূর্ণ প্রতিহত করতে না পারলেও এটি যুদ্ধের সম্ভাবনাকে যথেষ্ট হ্রাস করতে সক্ষম।

ছ. **যুদ্ধের ভয়াবহতা হ্রাস :** নিরস্ত্রীকরণের মাধ্যমে আণবিক ও পারমাণবিক অস্ত্রের সংখ্যা বিলুপ্ত করা বা কমিয়ে আনার মাধ্যমে যুদ্ধের ভয়াবহতা হ্রাস করা যায়। কারণ কোন পরাশক্তির কাছে যদি এসব মারণাস্ত্র না থাকে তাহলে তাদের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হলেও এসব মারাত্মক অস্ত্র ব্যবহৃত হবে না। ফলে ক্ষয়ক্ষতি বহুলাংশে হ্রাস পাবে।

জ. **জনস্বাস্থ্য রক্ষা :** পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে যে তেজস্ক্রিয় পদার্থ নিঃসৃত হয় তার ফলে পরিবেশ দূষিত হওয়াসহ জনস্বাস্থ্য হুমকির সম্মুখীন হয়। ১৯৮৬ সালের চেরনোবিল দুর্ঘটনার খেসারত আজও সে অঞ্চলের জনগণকে দিতে হচ্ছে এবং আরো কত দিন ধরে দিতে হবে তা কেউই বলতে পারে না। হিরোশিমা ও নাগাসাকির জনগণ পারমাণবিক অস্ত্রের বিধ্বংসী ক্ষমতার জীবন্ত সাক্ষী হয়ে রয়েছে। পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের কুফল অত্যন্ত ব্যাপক এবং সুদূরপ্রসারী। তাই দেখা যাচ্ছে যে, জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্যও নিরস্ত্রীকরণ অপরিহার্য।

ঝ. **বিশ্ব জনমত গঠন :** নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে পরাশক্তিগুলোর মধ্যে বিভিন্ন সময়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় তা বিশ্ব জনমত গঠনের কাজে সাহায্য করে। তাছাড়া এসব সম্মেলনে পারস্পরিক সাক্ষাতে মত বিনিময় ও তথ্যের আদান-প্রদানের মাধ্যমে যে সম্পর্ক গড়ে উঠে তা বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

১. **Partial Nuclear Test Ban Treaty (PTBT) :** পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে উঠে পঞ্চাশের দশকে। আর এতে প্রথম সফলতা দেখা দেয় ১৯৬৩ সালের ১০ অক্টোবর PTBT স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে। এ চুক্তিতে জলে ও বায়ুমণ্ডলে পারমাণবিক অস্ত্র বিস্ফোরণ নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু এতে ভূ-গর্ভে পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণের কথা বলা হয়নি। এই চুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা রাশিয়া স্বাক্ষর করলেও চীন ও ফ্রান্স এ চুক্তি স্বাক্ষর করেনি।

২. **Outer Space Treaty (মহাশূন্য চুক্তি) :** ১৯৬৭ সালের ২৭ জানুয়ারি মহাশূন্য চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। যা ১৯৬৮ সালের ১০ অক্টোবর থেকে কার্যকর হয়। এতে স্বাক্ষর করে ১০৪ টি দেশ। এ চুক্তিতে চাঁদসহ পৃথিবীর কক্ষপথে ও মহাশূন্যের অন্যান্য স্থানে পারমাণবিক অস্ত্রসহ অন্যান্য ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র স্থাপন বা বিস্ফোরণ নিষিদ্ধ করা হয়। এতে মহাশূন্যকে সামরিক কাজে ব্যবহার বা মহাশূন্যে পারমাণবিক অস্ত্র স্থাপন, মহাশূন্যে অস্ত্রভাণ্ডার গড়ে তোলা নিষিদ্ধ এবং শান্তিপূর্ণভাবে মহাকাশ অভিযানে পারস্পরিক সহযোগিতা করাই এ চুক্তির লক্ষ্য।

৩. **Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) :** ১৯৬৮ সালের ১ জুলাই জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী ৫ টি দেশ পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলোকে NPT স্বাক্ষরের আহবান জানায়। এ চুক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে পারমাণবিক দেশসমূহ থেকে অপারমাণবিক দেশগুলোতে পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার রোধ করা, পারমাণবিক দেশগুলোতে নিরস্ত্রীকরণ প্রক্রিয়া শুরু করা এবং বিশ্বের সকল দেশকেই পারমাণবিক প্রযুক্তিকে শান্তিপূর্ণ কাজে ব্যবহারের নিশ্চয়তা প্রদান করা। NPT কার্যকর হয় ১৯৭০ সালের ৫ মার্চ। এতে স্বাক্ষর করে ১৯০ টি দেশ। NPT স্বাক্ষর করেনি ভারত, পাকিস্তান, ইসরাইল, উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, কিউবা, লিবিয়া ও ব্রাজিল।

৪. **Seabed Arms Control Treaty :** ১৯৭১ সালের ১১ জানুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আরও কিছু দেশ এই চুক্তি স্বাক্ষর করে। যা ১৯৭৫ সালের ২৭ মে থেকে কার্যকর করা হয়। এ চুক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রত্যেক দেশের সমুদ্র উপকূল থেকে ১২ নটিক্যাল মাইল সমুদ্র সীমার বাইরে পারমাণবিক স্থাপনা ও প্রচণ্ড ধ্বংসাত্মক অস্ত্র মজুদ নিষিদ্ধ করা হয়।

৫. **Biological Weapons Convention :** ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, সোভিয়েত ইউনিয়নসহ আরও কয়েকটি দেশ জীবাণুঘটিত অস্ত্র ব্যবহাররোধ চুক্তি স্বাক্ষর করে। এ চুক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া ও বিষাক্ত পদার্থের ব্যবহারজনিত অস্ত্রের উপাদান, ব্যবহার, মজুদ, বিক্রি ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা। এতে স্বাক্ষর করে ১০৯ টি দেশ।

৬. **Anti-Ballistic Missile (ABM) Treaty :** ১৯৭২ সালের ২৬ মে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন মস্কোতে ABM-চুক্তি স্বাক্ষর করে। চুক্তিতে বলা হয় উভয় দেশেরই দুটি করে ABM সিস্টেম থাকবে এবং আগামী পাঁচ বছরের জন্য দুটি দেশই আক্রমণাত্মক অস্ত্র তৈরি করা থেকে বিরত থাকবে। এই চুক্তি ৩০ বছর কার্যকর ছিল। এই চুক্তি মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে অনুমোদন লাভ করলেও ২০০২ সালে ১৩ জুন পর্যন্ত সময়ে মার্কিন সিনেট এ চুক্তি অনুমোদন দেয়ার কথা থাকলেও অনুমোদন দেয়নি এবং আমেরিকা এ চুক্তি থেকে সরে আসে। অপরদিকে আমেরিকা তার নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে NMD (National Missile Defense) করার ফলে ABM চুক্তি বাহ্যত অর্থহীন হয়ে পড়ে।

৭. **Strategic Arms Limitation Talks (SALT)**

SALT- 1 : ১৯৭২ সালের ২৭ মে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন SALT- 1 চুক্তি স্বাক্ষর করে। এ চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল এন্টি ব্যালিস্টিক মিসাইল সিস্টেম সীমিতকরণ। এতে বলা হয় উভয় দেশেরই ১০০ টি আক্রমণাত্মক অস্ত্র এবং ১০০ টি প্রতিরক্ষা অস্ত্র থাকবে।

SALT- 2 : ১৯৭৯ সালের ১৮ জুন সোভিয়েত নেতা ব্রেজনেভ ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার **SALT- 2** চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এ চুক্তিতে উভয় দেশ ICBM (Intercontinental Ballistic Missile) এর সংখ্যা ২২৫০ এবং SLBM (Submarine Launched Ballistic Missile) এর সংখ্যা ২৪০০ এর মধ্যে রাখতে সম্মত হয়।

৮. **Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty (INFT) :** ১৯৮৭ সালের ৮ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডি. সি. তে সোভিয়েত নেতা মিখাইল গর্বাচেভ ও মার্কিন নেতা রোনাল্ড রিগ্যান মাঝারি পাল্লার পারমাণবিক অস্ত্র বিরোধী চুক্তি (INFT) স্বাক্ষর করেন। এ চুক্তি কার্যকর হয় ১৯৮৮ সালের ১ জুন। এ চুক্তিতে উভয় দেশ ভূমি থেকে নিক্ষেপযোগ্য ৫০০ কি. মি. থেকে ৫০০০ কি. মি. পাল্লার ICBM-গুলোর সংখ্যা ৫০% হ্রাস করতে সম্মত হয়।

৯. **Strategic Arms Reduction Treaty (START)**

SALT- 1 : ১৯৯১ সালের ৩১ জুলাই যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি অনুযায়ী দু'দেশের মধ্যে কৌশলগত অস্ত্র ৩০% হ্রাস করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এ চুক্তিতে উভয় দেশ ICBM-১৬০০ এর মধ্যে রাখা এবং ICBM-এর মাথায় Warhead এর সংখ্যা ৬০০০ রাখার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়।

SALT- 2 : ১৯৯২ সালের ৩ জানুয়ারি মার্কিন প্রেসিডেন্ট হার্বাট উইলিয়াম বুশ এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলিৎসিন START- 2 চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এ চুক্তিতে আগামী ১০ বছরে উভয় দেশের ICBM দুই-তৃতীয়াংশ হ্রাস করার এবং পারমাণবিক ওয়ারহেড এর সংখ্যা ৩৫০০-এর মধ্যে কমিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

১০. **Chemical Weapons Convention (CWC) :** ১৯৯৩ সালের ১৩ জানুয়ারি জাতিসংঘের নেতৃত্বে রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার রোধ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা ১৯৯৭ সালের ২৯ এপ্রিল থেকে কার্যকর হয়। এ চুক্তিতে সব ধরণের রাসায়নিক অস্ত্রের উপাদান, উন্নয়ন, ব্যবহার, মজুদ, বিক্রি ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হয়। এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে ১৬৫ টি দেশ।

১১. **Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty (CTBT) :** ১৯৯৬ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৫১তম অধিবেশনে সর্বাত্মক পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা রোধ চুক্তি (CTBT) পাস হয়। জাতিসংঘে CTBT উত্থাপন করে অস্ট্রেলিয়া। এতে স্বাক্ষর ১৮৩ টি দেশ এবং অনুমোদন করেছে ১৬৬ টি দেশ। CTBT-তে স্বাক্ষর করেনি ভারত, পাকিস্তান, ইসরাইল, উত্তর কোরিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, কিউবা, লিবিয়া, ব্রাজিল ইত্যাদি। চুক্তিটি পারমাণবিক অস্ত্রের গুণগত মান বৃদ্ধিকে প্রতিহত করে। চুক্তিটির ১৪(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বর্তমান বিশ্বে পারমাণবিক গবেষণা চুল্লির অধিকারী ৪৪ টি দেশের প্রত্যেকটি কর্তৃক চুক্তিটি স্বাক্ষরিত ও অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত চুক্তিটি কার্যকরী হবে না। চুক্তিটির Annex- 2 (তৃতীয় বিশ্বের জন্য) অনুযায়ী ৪৪ টি দেশের মধ্যে ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মাত্র ৩৫ টি দেশ অনুমোদন দিয়েছে। বাংলাদেশ ১৯৯৬ সালের ২৪ অক্টোবর ১২৯তম দেশ হিসেবে CTBT স্বাক্ষর করে এবং ২০০০ সালের ৮ মার্চ ২৮তম দেশ হিসেবে CTBT অনুমোদন করে।

১২. **Ottawa Treaty :** ১৯৯৭ সালের ৩ ডিসেম্বর জাতিসংঘের নেতৃত্বে কানাডার অটোয়া শহরে মানব বিধ্বংসী স্থলমাইন নিষিদ্ধকরণ চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। ১৯৯৯ সালে ১ মার্চ এই চুক্তিটি কার্যকর হয়। এ চুক্তিটিতে বিশ্বের স্বাধীন দেশগুলি স্থলমাইন উৎপাদন, ব্যবহার, মজুদ, হস্তান্তর নিষিদ্ধ এ বিষয়ে ঐক্যমত্য হয়। বর্তমানে এ চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশ ১৩৩ টি।

নিরস্ত্রীকরণের অন্তরায়

বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার জন্য নিরস্ত্রীকরণ অপরিহার্য। কিন্তু তা সত্ত্বেও এর বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। এগুলো হলো :

১. জাতীয় নিরাপত্তা স্বার্থে বিভিন্ন দেশ অস্ত্র উৎপাদন করে থাকে। যারা শান্তির নীতিতে বিশ্বাসী দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে অস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে। তাই কোন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও ন্যায্য জাতীয় স্বার্থ কার্যকরী করার জন্য যদি সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য প্রতিশ্রুতি না দেয়া যায় তবে কোনো রাষ্ট্রই নিরস্ত্রীকরণের কর্মসূচি গ্রহণে আগ্রহী হবে না।

২. বিশ্বরাজনীতিতে নিজ নিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন মারণাস্ত্রের সম্ভার। তাই আধিপত্য প্রতিষ্ঠার লিপ্সা নিরস্ত্রীকরণের পথে একটি বিরাট বাধা।

৩. নিরস্ত্রীকরণ কার্যকরী হলে উন্নত দেশগুলোর অনেক সামরিক শিল্প বন্ধ হয়ে যাবে এবং বেকার সমস্যা বেড়ে যাবে। এটিও নিরস্ত্রীকরণের একটি সমস্যা।

৪. নিরস্ত্রীকরণ উন্নত দেশগুলোর অস্ত্র রপ্তানি বাণিজ্যের পথে অন্তরায়। ফলে তারা এর পক্ষে নয়।

৫. প্রত্যেক দেশ ন্যূনতম কি পরিমাণ অস্ত্র মজুত রাখতে পারবে তা স্থির করে এবং সে বিষয়ে ঐক্যমত্যে পৌঁছানো অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। কারণ এসব আলোচনা পরাশক্তির প্রাধান্যই বজায় থাকে যা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য রাষ্ট্র মেনে নিতে রাজি হয় না। ফলে নিরস্ত্রীকরণ বাধাগ্রস্ত হয়।

৬. বিভিন্ন দেশের অস্ত্রের ধরণ ও প্রকৃতি, কার্যক্ষমতা, সংখ্যা প্রভৃতিতে অনেক পার্থক্য রয়েছে। তাছাড়া সামরিক বাহিনীর আকার, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি, দেশের সীমানা সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় সৈন্য সংখ্যা ইত্যাদিতেও পার্থক্য দেখা যায়। এমতাবস্থায় নিরস্ত্রীকরণের হার নির্ধারণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়- যা নিরস্ত্রীকরণের পথে অন্তরায়।

৭. নিরস্ত্রীকরণে চুক্তি কার্যকর করাও একটি বিরাট সমস্যা। কারণ একটি দেশ নিরস্ত্রীকরণ প্রস্তাব মেনে নেয়ার পর তা কার্যকরীকরণের চেষ্টা করছে কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ থেকেই যায়। এ অবিশ্বাসের ফলে নিরস্ত্রীকরণ বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

৮. আধুনিক মারণাস্ত্রের উন্নত প্রযুক্তিবিদ্যা গুণগত নিরস্ত্রীকরণকে অসম্ভব করে তুলেছে। বৃহৎ শক্তিসমূহ এখন অস্ত্র মজুত করার চেয়ে নিত্য নতুন মারণাস্ত্র তৈরির দিকেই ঝুঁকে পড়েছে। যাতে তারা প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে অধিক সুবিধা লাভ করতে পারে। তাই এখন অস্ত্র প্রতিযোগিতা চলে পরীক্ষাগারে, মাঠে নয়। ফলে প্রকৃত নিরস্ত্রীকরণ এখন অবাস্তব কল্পনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৯. নিরস্ত্রীকরণ চুক্তিতে স্বাক্ষরের পরও অনেকে সেটা গোপানে লংঘন করছে। গোপন অস্ত্র তৈরি ও মজুত প্রতিহত করার কার্যকরী ব্যবস্থা হিসেবে ইন্সপেকশন ভেরিফিকেশন-এর আশ্রয় নেয়া যেতে পারে। কিন্তু কোনো রাষ্ট্রই অন্যের তত্ত্বাবধান মেনে নিতে রাজি নয়- যা নিরস্ত্রীকরণের একটি বড় সমস্যা।

১০. নিরস্ত্রীকরণের একটি প্রধান বাধা হল আন্তর্জাতিক বিরোধ। কারণ এতে পরাশক্তিগুলো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত থাকে।

আলোচ্য বিষয়

Geo-politics (ভূ-রাজনীতি)

বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন অঞ্চল ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক গঠনে ভূ-রাজনীতি ও ভূ-অর্থনীতির প্রভাব অপরিসীম। একটি রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সাথে কী ধরনের সম্পর্ক তৈরি করবে এবং রাষ্ট্রের সাথে অপর রাষ্ট্রের সম্পর্ক কী হবে তা নির্ভর করে। একটি রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থান এবং তার অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর। আধুনিক ভূ-রাজনীতির ধারণার জন্ম বিশ শতকের প্রথম ভাগে অর্থাৎ ১৯০০ সালে। এর জনক রুডলফ জিলান। সাধারণভাবে রাজনৈতিক উপাদান ও প্রতিষ্ঠানের কৌশলগত প্রয়োগই হলো ভূ-রাজনীতি।

প্রখ্যাত ভূ-রাজনীতিবিদ নিকোলাস জে. স্পহিক ম্যান্তা ভূ-রাজনীতি সম্পর্কে বলেছেন, "ভূ-রাজনীতি হলো ভৌগোলিক উপাদানের ভিত্তিতে একটা দেশের নিরাপত্তা নীতির পরিকল্পনা।"

ভূ-রাজনীতি হলো একটি পররাষ্ট্রনীতি পদ্ধতি এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্ব। এটি বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যকার পারস্পরিক অবস্থানের সাবধানতার বিষয়ে গুরুত্ব প্রদান করে থাকে ও জাতীয় নিরাপত্তার প্রয়োজনে কৌশল হিসেবে কাজ করে থাকে। একটি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সম্পর্ক এবং প্রতিরক্ষা কৌশলসমূহের ওপর জাতীয় অবস্থান, সম্পদের লোকেশন এবং অন্যান্য ভৌগোলিক উপাদানসমূহের প্রভাব ও ভূ-রাজনীতির অন্তর্ভূক্ত। সর্বোপরি ভূ-রাজনীতি হলো কূটনীতির একটি বাস্তব নির্দেশিকা। যে কোনো দেশের আন্তর্জাতিক কৌশল নির্ধারণে ভূ-রাজনীতির গুরুত্ব অপরিসীম।

➘ ভৌগোলিক অবস্থানগত গুরুত্ব

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নে কোন রাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ কোন দেশের ভৌগোলিক দিকগুলো তার জাতীয় শক্তিকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। H. J. Morgenthau বলেছেন- "ভৌগোলিক অবস্থান সবচেয়ে স্থায়ী উপাদান যার উপর কোন দেশের জাতীয় শক্তি নির্ভর করে।" বর্তমান পৃথিবীতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নতির ফলে আধুনিক যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে সমগ্র জাতিসমূহের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে এক পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। এরূপ অবস্থা তাদেরকে বিভিন্নভাবে একে অপরের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসতে হয়। তাই নিজেদের মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হলে তাদের পারস্পরিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, মানবিক এমনকি প্রাকৃতিক ভূগোলের জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। এ দিক বিচার করলে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে আমরা গতিশীল ভূগোল বলতে পারি। আন্তর্জাতিক নির্ধারণে ভৌগলিক অবস্থান ও প্রকৃতির গুরুত্ব এত বেশি যে, নেপোলিয়ন একবার বলেছিলেন, "একটি দেশের পররাষ্ট্রনীতি তার ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রকৃতি দ্বারা নির্ধারিত হয়ে থাকে"।

ভৌগোলিক অবস্থান বিভিন্নভাবে কোন দেশের জাতীয় শক্তিকে বৃদ্ধি অথবা খর্ব করতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভৌগোলিক অবস্থানকে বিচার করলে আমরা দেখতে পাই যে, পৃথিবীর অন্যান্য মহাদেশ হতে চতুর্দিক থেকে কয়েক হাজার মাইল জলবেষ্টিত বলে তার শক্তি অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। কারণ অন্যান্য বৃহৎ শক্তি অতি সহজে আক্রমণ করতে পারে না। অনুরূপভাবে ইংলিশ চ্যানেল দ্বারা মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্নতা ইংল্যান্ডের জাতীয় শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। ইতিহাসল জ্ঞান থেকে আমরা জানতে পারি যে, জুলিয়াস সিজার, দ্বিতীয় ফিলিপ, নেপোলিয়ন অথবা হিটলার চেষ্টা করেও ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করে ইংল্যান্ডকে আক্রমণ করতে পারেন নি এবং তার কোনরূপ ক্ষতি সাধনে সক্ষম হয়নি।

অন্যদিকে আল্পস পর্বত দ্বারা অবশিষ্ট ইউরোপ থেকে ইতালির বিচ্ছিন্নতা তার জাতীয় শক্তিকে বৃদ্ধি না করে বরং খর্ব করেছে। এর কারণ হল যে, আল্পস পর্বতের উপত্যকাসমূহ দক্ষিণ দিকে ঢালু থাকার ফলে মধ্য ইউরোপ থেকে ইতালিকে আক্রমণ করা যত সহজ, ইতালির পক্ষে ইউরোপের অন্য দেশগুলোকে আক্রমণ করা তত কঠিন।

কোন দেশের অবস্থান যদি এমন হয় যে, সমসামরিক বৃহৎ শক্তিগুলোর স্বার্থ সেখানে জড়িত, তবে সে অবস্থান তার পররাষ্ট্রনীতি ও প্রতিরক্ষানীতিকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করবে। আফগানিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের ভৌগোলিক অবস্থানের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে ব্যাপারটি আরো পরিস্কার হবে। গত দু শতাব্দীর অধিককালে যাবৎ আফগানিস্তান ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ও জার শাসিত রাশিয়ার মধ্যে অবস্থিত বলে তাকে এই দুটি পরস্পরবিরোধী সাম্রাজ্যের লোলুপদৃষ্টি থেকে মুক্ত থাকার জন্য সব সময় সতর্ক থাকতে হয়েছে, এমনকি অনেকগুলো অহেতুক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। কিন্তু নিউজিল্যান্ড এমন দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত যে, তাকে কখনও এরকম পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়নি। আফগানিস্তানের সাম্প্রতিক সমস্যাও তার গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে। কারণ সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি আফগানিস্তানকে পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারত, তবে দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়ার তার প্রভাব অনেক বৃদ্ধি পেত। ইন্দোচীনের বিভিন্ন যুদ্ধও তাদের ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্বের জন্যই সংঘটিত হয়েছিল।

দুই বৃহৎ শক্তি মধ্যখানে অবস্থিত সংঘর্ষ নিবারক রাষ্ট্রের অসুবিধার জন্য দায়ী প্রধানত তার ভৌগোলিক অবস্থান। এরূপ একটি রাষ্ট্র ইচ্ছা করলেও অনেক সময় যুদ্ধকে এড়িয়ে চলতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ জার্মানি ও ফ্রান্সের মধ্যবর্তী সংঘর্ষ নিবারক রাষ্ট্র বেলজিয়ামকে অনেক সময়ই এ-দুটি রাষ্ট্রের পারস্পরিক শত্রুতার জন্য মারাত্মক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছে কারণ তারা প্রায় বেলজিয়ামের উপর দিয়েই সৈন্য চালনা করেছে। একইভাবে পোল্যান্ডের ইতিহাস অধ্যয়ন করলে আমরা দেখতে পাই যে, ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য দেশটি বারবার তার চতুর্দিকের বৃহৎ শক্তিগুলোর লোভের শিকারে পরিণত হয়েছে।

ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যই স্থলবেষ্টিত দেশগুলো অনেক অসুবিধা ভোগ করে। আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তারা সস্তা ও সুবিধাজনক জলপথ ব্যবহার করতে পারে না। এছাড়া তাদের কোন রাষ্ট্রীয় সমুদ্র এলাকা না থাকায় তারা অনেক গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও সম্পদ থেকে বঞ্চিত হয়। এসব দেশকে প্রায় সবসময়ই অপর দেশের মুখাপেক্ষী হতে হয়। উদাহরণস্বরূপ আফগানিস্তান, নেপাল, জাম্বিয়া, লেসোথো প্রভৃতি দেশের কথা উল্লেখ করা যায়। লেসোথের ভৌগোলিক অবস্থান অধিক অসুবিধাজনক কারণ এটি স্থলবেষ্টিত একটি মাত্র দেশ যা দক্ষিণ আফ্রিকা দ্বারা পরিবেষ্টিত, যে কারণে তাকে দেশটির বর্ণবাদী সরকারের কর্তৃত্ব স্বীকার করতে হত। এছাড়া উপকূলবর্তী দেশগুলো অনেক সুবিধা ভোগ করে। ইসরাইলের ভৌগোলিক অবস্থানের কথা আলোচনা করলেই বিষয়টি ভালভাবে বোঝা যাবে। ক্ষুদ্র হওয়ার কথা। কিন্তু সমুদ্রে সহজে প্রবেশাধিকার আছে বলে ইসরাইল জলপথে দূরবর্তী বন্ধুদেশগুলোর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে প্রতিরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। তা না হলে ঘৃণ্য নীতি ও কার্যকলাপের জন্য এতদিনে আরব দেশগুলোর চাপে তার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যাবার কথা। রাশিয়ার ভৌগোলিক অবস্থান এমন যে, তাকে জারের আমল থেকেই দক্ষিণ দিকে সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণ করতে হয়েছে।

এছাড়াও ভৌগোলিক অবস্থানই নির্ধারণ করে যে, কোন দেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সহায়ক প্রাকৃতিক সীমান্ত আছে কি না। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পশ্চিমা শক্তিবর্গের মধ্যে এরূপ প্রকৃতিপ্রদত্ত সীমান্ত ছিল না বলে তাদের মধ্যে বিরোধের একটা চিরস্থায়ী সম্ভাবনা বিরাজমান ছিল। ভারত ও পাকিস্তানের ব্যাপারেও এ কথাটি সমভাবে প্রযোজ্য।

আরেকটি ভৌগোলিক দিক যার উপর জাতীয় শক্তি নির্ভর করে তা হল কোন দেশের আয়তন। স্বভাতই বৃহৎ আয়তনের দেশ অধিক শক্তির অধিকারী হয়ে থাকে। স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন বিশ্বের দুই পরাশক্তির দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়ই বিশাল ভূ-ভাগের মালিক। এটা তাদের জাতীয় শক্তির একটা চিরস্থায়ী সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হত, কারণ তাদের এই বৃহৎ ব্যাপ্তি বাইরে থেকে আক্রমণ করে এ দুটি দেশকে অধিকার করার যে কোন আকাঙ্খাকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করতে সক্ষম বলে বিবেচিত হত। ইতিহাসের দিকে আরেকবার তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, নেপোলিয়ান ও হিটলার রাশিয়া দখল করতে গিয়ে সাফল্য তো পায় নি, বরং রাশিয়া অভিযান তাদের উভয়ের জন্য পরাজয় ডেকে এনেছে। এর কারণস্বরূপ অধ্যাপক মর্গেন থু বলেছেন, রাশিয়ার ভূমিকে জয় করা বিজেতার জন্য সম্পদ নয় বরং দায় হিসিবে বিবেচনা করতে বাধ্য করে। বিজেতা রাশিয়ার ভূমিকে গ্রাস করে এ থেকে শক্তি লাভ তো করেই না, বরং রাশিয়ার ভূমিই বিজেতাকে গ্রাস করে এবং তার শক্তিকে ধ্বংস করে। এটা সম্ভব হয়েছে রাশিয়ার ভৌগোলিক গভীরতার জন্য। অর্থাৎ কোন বাইরের দেশের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য তার পশ্চাদপসারণে প্রয়োজনীয় ভূমি রয়েছে। সুতরাং যে দেশের ভৌগোলিক গভীরতা যত বেশি অর্থাৎ যে দেশ বহিঃশত্রুর আক্রমণের মোকাবিলায় অধিকক্ষণ টিকে থাকার ব্যাপারে তার বিস্তৃত ভূমি দ্বারা অধিক সহায়তা লাভ করে সে দেশ তত শক্তিশালী। আধুনিক পারমাণবিক ও মহাশূন্যণ্য যুগে একথাটি অধিক প্রযোজ্য। এটা সত্য যে, কোন পারমাণবিক ভীতি প্রদর্শনকে বিশ্বাসযোগ্য করতে হলে সে দেশের থাকা উচিত বিশাল ভূমি, যার ফলে সে তার নিজ রাজধানী, জনবসতি কেন্দ্র ও শিল্পকারখানাগুলো পৃথক স্থানে ছড়িয়ে রাখতে পারে। স্নায়ুযুদ্ধ চলাকালীন বিশ্বের উভয় পরাশক্তি এ-দিক থেকে ভাগ্যবান ছিল বলেই তাদের শক্তিকে অনেকাংশে বৃদ্ধি করতে পেরেছিল।

কোন দেশের আয়তনের সাথে সাথে আমাদের চিন্তা করতে হয় আকৃতি সম্পর্কে। সাধারণত একই আয়তন বিশিষ্ট আঁটসাঁট আকৃতি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আকৃতির চেয়ে অধিক সুবিধাজনক। কারণ, প্রথম ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ক্ষেত্রের চেয়ে আন্তর্জাতিক সীমারেখা কম থাকায় জাতীয় নিরাপত্তার বিষয়ে কম চিন্তাভাবনা করতে হয়। ফ্রান্সের মত মাঝারি আয়তনের দেশ যা অনেকটা গোলাকৃতি বিশিষ্ট এবং যার রাজধানী মাঝখানে অবস্থিত, তাই ফ্রান্স হল জাতীয় শক্তির বৃদ্ধির জন্য আদর্শ রাষ্ট্রের উদাহরণ।

এছাড়াও অন্যান্য ভৌগোলিক দিক যেমন কোন দেশের জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি ইত্যাদি তার জাতীয় শক্তিকে কিছুটা প্রভাবিত করে। কোন দেশের জলবায়ুর উপর সে দেশের জনসাধারণের স্বাস্থ্য, শক্তি ও কর্মক্ষমতা নির্ভর করে। এ জন্যই দেখা যায় কোন কোন দেশের লোক অধিক কর্মক্ষম, আবার অনেক দেশের লোকজন অলস ও কর্মবিমুখ। সাধারণত নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুই জনগণের মধ্যে অধিক কর্মক্ষমতা যুগিয়ে তার জাতীয় উন্নতিতে সহায়তা করে থাকে। অপরদিকে অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, ভূমিকম্প ইত্যাদি অনেক দেশের জাতীয় উন্নতিকে ব্যাহত করে। ভূ-প্রকৃতির দিক থেকে দেখতে গেলে বলা যায়, বন্ধুর অর্থাৎ উঁচু নিচু ভূ-প্রকৃতির কোন দেশের যাতায়াত ব্যবস্থায় বিঘ্নের সৃষ্টি করে। কিন্তু যে দেশ বিশাল বিস্তৃত সমভূমির অধিকারী সে দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগ ও যাতায়াত ব্যবস্থার সুবিধার জন্য অতি সহজেই রাজনৈতিকও সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে ওঠে, যা জাতীয় শক্তি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

↘ ভূ-অর্থনীতির গুরুত্ব

প্রাকৃতিক সম্পদ একটি স্থায়ী উপাদান, যা কোন দেশের জাতীয় শক্তি বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রাকৃতিক সম্পদ ও এর উপর নির্ভরশীল শিল্পকারখানা ভূ-অর্থনীতির নির্দেশক। প্রাকৃতিক সম্পদের উপরই কোন দেশের অর্থনৈতিক তথা সার্বিক উন্নতি বহুলাংশে নির্ভর করে। প্রাকৃতিক সম্পদকে খাদ্য ও কাঁচামাল এ দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

ক. খাদ্য

খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা কোন দেশের জাতীয় শক্তি বৃদ্ধির জন্য অতীব প্রয়োজন। সাধারণত যে দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ, সে দেশ খাদ্যঘাটতি দেশের তুলনায় অনেক সুবিধাজনক স্থানে অবস্থান করে। ভূ-অর্থনীতিতে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্নায়ু যুদ্ধকালে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের প্রভাব ও প্রতিপত্তিকে অধিকতর বাড়াতে সমর্থ হয়েছিল। ব্রিটেন ও জার্মানি খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ না হওয়ায় অনেক সময়ই তাদের দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। দুটি বিশ্বযুদ্ধেই জার্মানি খাদ্যভাবের দরূণ যুদ্ধে প্রাথমিক সাফল্যকে কাজে লাগাতে পারেনি, কারণ দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে কষ্টকর ছিল।

বর্তমান পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই খাদ্যে স্বনির্ভর না হওয়ার দরূণ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের অনেক দুর্বলতা থেকে যায়। উদাহারণস্বরূপ, বাংলাদেশকে খাদ্যের জন্য বহির্বিশ্বের উপর নির্ভর করতে হয় বলে তাকে অনেক সময় বাধ্য হয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এমন নীতি গ্রহণ করতে হয়, যা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হলে কখনও গ্রহণ করতে হতো না। এভাবে অনেক খাদ্য ঘাটতির দেশই নিজের বৈদিশিক নীতি পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়।

খ. কাঁচামাল

কোন দেশের জাতীয় শক্তি বৃদ্ধিতে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা যেমন প্রয়োজনীয়, তেমনি প্রয়োজনীয় ঐ দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ও কাঁচামাল, যা শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদন, বিশেষত যুদ্ধের সরঞ্জাম তৈরিতে যথেষ্ট সাহায্য করতে পারে।

বস্তুত শিল্প বিপ্লবের পর থেকেই বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের আপেক্ষিক ও চূড়ান্ত গুরুত্বের পরিমাণ পরিবর্তিত হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকে শক্তির উৎস হিসেবে খনিজ তেলের গুরুত্ব বেড়ে যায় এবং তেলসমৃদ্ধ দেশগুলো আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে আরম্ভ করে। বর্তমান বিশ্বে মাত্র তিন দশকের মধ্যেই তেলসম্পদে সমৃদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যের আরব দেশগুলো আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে অনেকাংশে প্রভাবিত করছে।

আধুনিক পারমাণবিক ও মহাশূণ্য যুগে গুরুত্বপূর্ণ কাজে ইউরেনিয়াম ব্যবহৃত হয় বলে ঐ ধাতুর অর্থনৈতিক ও সামরিক মূল্য বেড়ে গেছে। এ জন্যই উক্ত ধাতুর অধিকারী দেশ জিম্বাবুয়েতে দীর্ঘকাল ধরে শ্বেতাঙ্গ সংখ্যালঘু সরকার ক্ষমতায় থাকার পরও কোন বৃহৎ শক্তিই তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি। যদিও আন্তর্জাতিকভাবে ঐ বর্ণবাদী সরকার ধিকৃত হয়েছে। এর কারণ শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো তাদের যুদ্ধাস্ত্র তৈরির কাজে জিম্বাবুয়ের ইউরোনিয়ামের উপর অনেকটা নির্ভরশীল।

আবার, প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও সেগুলোকে যথার্থভাবে ব্যবহার করে জাতীয় উন্নতির জন্য পরিপূর্ণভাবে কাজে লাগাতে না পারলে কোন দেশের ভূ-অর্থনীতি দুর্বল বলে চিহ্নিত হয়। উদাহরণস্বরূপ-আফ্রিকার জায়ার প্রজাতন্ত্র ইউরেনিয়ামের মতো মূল্যবান খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও এটা থেকে শক্তি উৎপাদনের কারিগরি জ্ঞানের অভাবে দেশটি অন্যান্য বৃহৎ শক্তি যেমন- যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, বৃটেন, জার্মানি, এমনকি চেক রিপাবলিক, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। আরেকভাবে, ভারত প্রচুর কয়লা, লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাকে শক্তিশালী হিসেবে গণ্য করা যায় না। এর কারণ, উক্ত দেশে দুটি শিল্পের অনগ্রসরতার কারণে তাদের কাঁচামালকে উপযুক্তভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম নয়। ফলে তার জাতীয় শক্তির সম্ভাবনা ও বাস্তবক্ষেত্রে প্রাপ্ত জাতীয় শক্তির মধ্যে এক বিরাট ব্যবধান পরিলক্ষিত হয়। এছাড়াও আধুনিক বিশ্বে মধ্যপ্রাচ্যের তেলসমৃদ্ধ আরবদেশগুলো মাথাপিছু জাতীয় আয়ের ভিত্তিতে পৃথিবীতে প্রথম দিকের স্থানগুলো দখল করলেও শিল্পসামর্থ্যের অভাবে জাতীয় শক্তির দিক থেকে তাদের অবস্থান অনেক নিচে।

STUDENT STUDY

বর্তমান বিশ্ব ক্ষুধা, দারিদ্র, অপুষ্টি, নিরক্ষরতা, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ প্রভৃতি নানা সমস্যায় জর্জরিত। কিন্তু এ সকল মানবিক সমস্যাকে পেছনে ফেলে যে সমস্যাটি বর্তমানে গোটা বিশ্ব সম্প্রদায়কে রীতিমত অস্থির ও আতঙ্কগ্রস্থ করে তুলেছে তা হচ্ছে সন্ত্রাসবাদ বা Terrorism। সন্ত্রাসবাদ নামক জুজুর ভয়ে বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্রতো বটেই, পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো ও চরম আতঙ্কে দিনাতিপাত করছে। আর তাইতো প্রতিনিয়ত এই সন্ত্রাসবাদ নিয়ে চলছে বিস্তর গবেষণা, চলছে সন্ত্রাসবাদের মূল কারণ অনুসন্ধানের কাজ এবং এর প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবনের প্রাণন্তকর প্রয়াস।

সন্ত্রাসবাদ কী : সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা নিয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। সন্ত্রাসবাদের সর্বজন স্বীকৃত সংজ্ঞা তাই এখনো প্রণয়ন করা সম্ভব হয় নি। Brian Jenkins এর মতে, "Terrorism is the use or threatened use of force designed to bring about political change" অর্থাৎ রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধনের উদ্দেশ্যে শক্তি প্রয়োগ বা শক্তি প্রয়োগের হুমকিই হচ্ছে সন্ত্রাসবাদ। অন্যদিকে Walter lagueur এর মতে, "Terrorism Constitutes the illegitimate use of force achieve political objective when innocent are targeted" অর্থাৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিরাপরাধ জনগণকে লক্ষ্য করে অবৈধ শক্তি প্রয়োগই হচ্ছে সন্ত্রসবাদ। তবে সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা আর যাই হোক না কেন এটি একটি অশুভ শক্তি এবং একে নির্মূল করাই মূল কথা।

সন্ত্রাসবাদের কারণ : সন্ত্রাসবাদ একটি ভয়ানক ব্যাধি। যে ব্যাধিতে বিশ্বব্যাপি আজ সংক্রান্ত। আর তা নিরসন কল্পে জাতি ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাই এখন সোচ্চার। সন্ত্রাসবাদে কারণ বিভিন্ন হলেও মূলত রাজনৈতিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক, সংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি কারণে সন্ত্রাসবাদের জন্ম হয়ে থাকে। সন্ত্রাসবাদের মূল কারণ অনুসন্ধানের জন্য ২০০৩ সালের ৯-১১ জুন নরওয়ের রাজধানী আসলোতে "The Norwegian Institute of International Affairs' বিশ্বের সন্ত্রাসবাদ বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি সম্মেলনের আয়োজন করে। সম্মেলনে সন্ত্রাসবাদের যেসব মূল কারণ চিহ্নিত ও উপস্থাপিত হয় সেগুলো নিম্নরূপ-

১. **ক্ষমতার ভারসাম্যহীন :** বর্তমান বিশ্বে সন্ত্রাসবাদের মূল কারন হচ্ছে ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা বা Imballaniee of Power. ১৯৯১ সালে USSR-এর পতনের পর সমগ্র বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ কার্যত চলে এসছে USA-এর হাতে। সেই সাথে সৃষ্টি হয়েছে কিছু আঞ্চলিক পরাশক্তি। শক্তির এই অসমতাই এতটাই প্রকট যে, নির্যাতিত নিপীড়িত জনগোষ্ঠী যখন নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে কোন সমস্যার সমাধান করতে পারছে না তখনই আশ্রয় নিচ্ছে সন্ত্রাসের।

২. **ধর্মীয় উগ্রবাদ :** পৃথিবীতে অনেক ধর্মীয় গোষ্ঠী আছে যারা মনে করে তাদের বিরোধীদের হত্যা করা বা নির্মূল করা পূন্যের কাজ। আবার অনেক মুসলমান আছে যারা মনে করে বিধর্মীদের হত্যা করা জিহাদ। তেমনি অনেক উগ্রপন্থি খ্রিস্টান এটাকে Crused বা পবিত্র ধর্মযুদ্ধ মনে করে। ফলে জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সবাই জড়িয়ে পড়ছে সন্ত্রাসবাদে। প্রকৃতপক্ষে ধর্মীয় মূলনীতির অপব্যাখ্যার ফলে সৃষ্ট ধর্মীয় উগ্রবাদ বর্তমানে সন্ত্রাসের অন্যতম কারণ।

৩. **আগ্রাসন :** অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রগুলো ওপর ক্ষমতাধর রাষ্ট্রগুলোর আগ্রাসন সন্ত্রাসবাদের জন্ম দিচ্ছে এবং গোটা বিশ্বকে বিপজ্জনক করে তুলছে। Cold War-এর যুগে আমরা এর বিকাশ লক্ষ্য করেছি। এমনকি একবিংশ শতাব্দীতে সভ্যতার চরম উৎকর্ষতা সাধনের এই যুগে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আফগানিস্তান ও ইরাকে চালানো আগ্রাসন গোটা বিশ্বকে সন্ত্রাসবাদের উর্বর লীলাভূমিতে পরিণত করেছে।

৪. **সন্ত্রাসে মদদ দান :** বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো যখন তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে মদদ যোগায় তখন নিরস্ত্র নির্যাতিত জনগণ অনন্যোপায় হয়ে সন্ত্রাসের পথ বেছে নেয়। এর জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ইসরাইলক নৈতিক ও আর্থিক সমর্থন।

৫. **ধর্মীয় ও বর্ণবৈষম্য ;** বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে শুধু ধর্ম ও বর্ণের কারণে অনেক মানুষ প্রতিনিয়ত বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। কোন অঞ্চলের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় যখন ধর্মীয় ও বর্ণবাদী কারনে তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় তখন তারা বেছে নেয় সন্ত্রাসের পথ।

৬. **রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ :** সন্ত্রাসী কার্মকাণ্ড বিস্তারের আরেকটি প্রধান কারণে হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ। পৃথিবীতে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদের সবচেয়ে বড় উদাহরণ হল ইসরাইল। এই নীতির কারণে সন্ত্রাসবাদ বৃদ্ধি পাচ্ছে, শিকার হচ্ছে তারা নিজেরাই।

৭. **দ্রুত আধুনিকায়ন :** দ্রুত আধুনিকায়নের ফলে বিশ্বের একশ্রেণির মানুষ হচ্ছে সুবিধাভোগী অপরদিকে বাকিদের জীবনযাত্রা অত্যন্ত নিম্নমানের। ফলে সৃষ্টি হচ্ছে সামজিক অসন্তোষের। যা সন্ত্রাসবাদের অন্যতম কারণ।

এছাড়াও দরিদ্র অর্থনৈতিক বৈষম্য, দ্রুত পরিবহন যোগাযোগ, সংবাদ মাধ্যম, মারনাস্ত্রের ব্যবহার, পাল্টা সন্ত্রাস তথা সন্ত্রাসের মাধ্যমে সন্ত্রাস দমননীতির ফলে বিশ্বে সন্ত্রাসবাদ উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সন্ত্রাসবাদ প্রতিকারের উপায় : সন্ত্রাসবাদ নামক ঘৃণ্য ব্যধি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য বিশ্বের প্রতিটি সুস্থ বিবেকসম্পন্ন মানুষ এখন সোচ্ছার ও সচেতন। তাই যেসব পরিস্থিতির কারণে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের জন্ম হয় সেগুলো চিহ্নিত করে তা প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে

পারলেই কেবল সন্ত্রাসবাদ বন্ধ করা সম্ভব। 'UN Anti Terrorism' দপ্তরের কর্মকর্তা Dr. Alex P. Schmid সন্ত্রাসবাদ প্রতিকারের জন্য যেসব ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেছেন, সেগুলো হল-

১. **রাজনৈতিক ও সরকারি ব্যবস্থা :** সন্ত্রাসবাদকে প্রথম রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করতে হবে। আর এজন্য প্রত্যেক সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। আর এই জন্য রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিশ্চিত করতে হবে-

   ক. সুশাসন (Good Governance)

   খ. গণতন্ত্র (Democracy)

   গ. আইনের শাসন (Rule of Law)

   ঘ. সামাজিক ন্যায়বিচার (Social justice)

২. **অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা :** সন্ত্রাসের প্রতিকার চাইলে অবশ্যই অর্থনৈতিক ও সামাজিক কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মূলত অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে পারলে বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসী কার্যক্রম অনেকাংশে কমে যাবে।

৩. **মনস্তাত্ত্বিক-শিক্ষামূলক ও যোগাযোগ ব্যবস্থা :** সন্ত্রাসীদের দলভূক্তির বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার-প্রাপাগান্ডা চালাতে হবে। সন্ত্রাসীদের দুর্বল করার জন্য প্রকাশ্যে ও গোপনে প্রতিরক্ষামূলক ও আক্রমণাত্মক মনস্তাত্ত্বিক অভিযান চালাতে হবে।

৪. **সামরিক ব্যবস্থা :** ক্ষেত্রবিশেষ ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে সীমিত আকারের সামরিক পদক্ষেপ নিতে হবে।

৫. **বিচার বিভাগীয় ও আইনি ব্যবস্থা :** সন্ত্রাস দমনের জন্য বিচার বিভাগ ও আইনি ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করতে হবে। সন্ত্রাসীদের যাতে আইনের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যায় সে ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. **গোয়েন্দা তৎপরতা ব্যবস্থা :** সন্ত্রাস দমনে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থাসমূহের মধ্যে গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়ে জোরদার করতে হবে। সেই সাথে সন্ত্রাসীদের কার্যক্রম, বস্তুগত সহায়তা ও অর্থায়নের উৎস খুঁজে বের করতে হবে।

৭. **পুলিশ ও জেলখানা পদ্ধতি ব্যবস্থা :** পুলিশের ব্যাপারে জনগণের মধ্যে আস্থা গড়ে তুলতে হবে যাতে তারা স্বত:স্ফুর্তভাবে পুলিশের কাছে সন্ত্রাসীদের তথ্য জানতে পারে। তেমনিভাবে আটককৃত অনুতপ্ত সন্ত্রাসীদের কাজে লাগিয়ে বন্দি ও অন্যান্য সন্ত্রাসীদের নৈতিক মনোবল ভেঙে দিতে হবে।

পৃথিবীতে মানুষ কখনও সন্ত্রাসী হয়ে জন্মায় না, পরিস্থিতিই তাকে সন্ত্রাসী হতে বাধ্য করে। আর তাই বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসবাদ বিস্তারের মূল কারণগুলো চিহ্নিত করে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। সর্বোপরি রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মানবাধিকার, আইনের শাসন, অর্থনৈতিক ভারসাম্য ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে পারলে সন্ত্রাস দমন সম্ভব বলে আন্তর্জাতিক রাজনীতিক ও সামরিক বিশ্লেষকগণ মনে করেন।

Nationanalism, Imperialism, Colonialism & Neo-colonialism

জাতীয়তাবাদ

জাতীয়তাবাদ : জাতীয়তাবাদ হল জাতীয় ঐক্যানুভূতি। কোন নির্দিষ্ট আবাসভূমির সাথে সংশ্লিষ্ট সংঘবদ্ধভাবে বিশেষ অন্তরঙ্গ, গুরুত্বপূর্ণ এবং মর্যাদাযুক্ত অনুভূতির প্রকাশকেই জাতীয়তাবাদ বলে। মূলত জাতীয়বাদ একটি চেতনাবিশেষ। জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ জনসমষ্টি তাদেরকে পৃথিবীর অন্য সকল জনসমষ্টি থেকে পৃথক করে দেখে। এটা কোন নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে বসবাসকারী জনসমষ্টির সচেনতার ফল।

জাতীয়তাবাদের সংজ্ঞা

➪ **জাতীয়বাদের সংজ্ঞায় Colins English Dictionary তে বলা হয়েছে-**
"A sentiment based on common cultural charecteristics that binds population and often produces a policy of national independence and separation."

➪ **Oxford Advanced Learners Dictionary তে বলা হয়েছে-**
"The desire by a group of people who share the same race, culture, language etc. to form an independent country."

সুতরাং, জাতীয়তাবাদ হচ্ছে কোন নির্দিষ্ট ভৌগলিক এলাকায় জনগণের মধ্যে ক্ষমতা বা ঐক্যের অনুভূতি, যা তাদেরকে অন্যদের থেকে আলাদা করে জাতিরাষ্ট্র গঠনে উদ্বুদ্ধ করে।

জাতীয়তাবাদের উপাদান

০১. **ভৌগোলিক ঐক্য :** জাতীয়তাবাদ গঠনের অন্যতম প্রধান উপাদান হল ভৌগোলিক ঐক্য। একই ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে বহুদিন ধরে বেশ কিছু সংখ্যক মানুষ একত্রে বসবাস করতে থাকলে অধিবাসীদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই এক গভীর একাত্মবোধের সৃষ্টি হয়।

০২. **ধর্মীয় ঐক্য :** ধর্মীয় ঐক্য জাতীয়তাবাদ গঠনের অন্যতম শক্তিশালী উপাদান। একই ধরনের রীতি-নীতি অনুসরণ একই ধরনের আধ্যাত্মিক চেতনা মানব সমাজে ঐক্য সৃষ্টি করে যা জাতীয়তাবাদ গঠনে সহায়তা করে।

০৩. **রাজনৈতিক ঐক্য :** দীর্ঘকাল ধরে কোন জনসমাজ একই রাজনৈতিক সংস্কৃতির অধীন থাকলে তাদের মধ্যে সহজেই ঐক্যবোধ সৃষ্টি হয়। একই ধরণের রাজনৈতিক ঐক্য অধিবাসীদের মধ্যে একাত্মবোধের সৃষ্টি করে।

০৪. **বংশগত ঐক্য :** বংশগত ঐক জাতীয়তাবাদ গঠনে অন্যতম উপাদান। কোন জনসমষ্টি যখন বিশ্বাস করে যে, তাদের শিরা-উপশিরায় একই রক্ত প্রবাহিত এবং তাদের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য অভিন্ন তখন স্বভাবতই তাদের মধ্যে স্বজনপ্রীতি দেখা দেয়।

০৫. **ভাষাগত ঐক্য :** একই ভাষাভাষী জনগণের মধ্যে খুব সহজেই পরস্পরের মনোরাজ্যের পরিচয় পেয়ে একাত্ম হতে পারে। ভাষাগত ঐক্য জাতীয়তার এক গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি হলেও বহু ভাষাভাষি জনসমষ্টি নিয়েও অনেক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দেশও রয়েছে।

০৬. **ঐতিহ্যগত ঐক্য :** সুদূর অতীত থেকেই ঐতিহ্যগত ঐক্য বিভিন্ন জনসমাজের মধ্যে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। সুদীর্ঘকাল ধরে একই ভূ-খণ্ডে বসবাস করলে জনসমাজের মধ্যে ইতিহাস, কৃষ্টি ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সমন্বয় সাধনের ফলে ঐতিহ্যগত ঐক্য গড়ে উঠে। এরূপ ঐতিহ্যগত ঐক্য জাতীয়তাবাদ গঠনে অত্যন্ত সহায়ক উপাদান হিসেবে কাজ করে।

০৭. **অর্থনৈতিক ঐক্য :** অর্থনৈতিক ঐক্য জাতীয়তাবাদের অন্যতম উপাদান। অর্থনৈতিক সমস্বার্থ জনগণকে ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

০৮. **পারস্পরিক যোগাযোগের সামর্থ্যতা :** উন্নত যোগাযোগের মাধ্যমে জনসমাজের সদস্যগণ ভাবের আদান-প্রদান করতে পারে এবং জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হতে পারে।

০৯. **জাতীয় চরিত্র ও প্রকৃতি :** একই ধরনের পরিবেশ, ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা, সামাজিক ও আইনগত প্রতিষ্ঠানাদি এক ধরনের গোষ্ঠী ঐক্য গড়ে তোলে। গোষ্ঠী ঐক্য হতে বিবর্তনের মাধ্যমে জাতীয় চরিত্র গঠিত হয় যা জাতীয়তাবাদ গঠনের ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

১০. **সম্মোহনী নেতৃত্ব :** কোন বিশেষ ব্যক্তির সম্মোহনী নেতৃত্ব জনসমাজকে জাতীয়তাবোধ আকস্মিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে জার্মানবাসীকে প্রচন্ড জাতীয়তাবোধে ঐক্যবদ্ধ করতে পেরেছিল।

১১. **ভাবগত উপাদান :** রাষ্ট্রের জনসাধারণের মধ্যে ভাবগত ঐক্যের ভিত্তিতেই জনসমাজের মধ্যে জাতীয়তাবোধ গভীরভাবে জাগরিত হতে পারে। অধ্যাপক গেটেল এর মতে, আধুনিক রাষ্ট্রের ঐক্যের ভিত্তি বাহ্যিক নয়, সম্পূর্ণ মানসিক। তিনি আরও বলেন, জাতীয়তা আসলে একটি ভাবগত ব্যাপার, একটি মানসিক অবস্থা, জীবনযাত্রা, চিন্তা এবং অনুভূতির একটি পদ্ধতি।

জাতীয়তাবাদের প্রভাব/ জাতীয়তাবাদ ও আধুনিক সভ্যতা

ক. জাতীয়তাবাদের ইতিবাচক প্রভাব

০১. **বিশ্ব সভ্যতা সমৃদ্ধিকারী :** জাতীয়তাবাদ বিভিন্ন সময়ে স্বীয় বৈশিষ্ট্য দ্বারা বিশ্ব সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেছে। প্রত্যেক জাতিরই বিশেষ কতকগুলোই বৈশিষ্ট্য ও গুণ আছে। সমগ্র মানব সভ্যতার জন্য সেগুলো সংরক্ষণ করা উচিত। জাতীয়তাবাদ এ দায়িত্ব পালন করে থাকে।

০২. **বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ জোরদার :** জাতীয়তাবাদ এমন একটি শক্তি যা বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ ও মানব সভ্যতার সাথে অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত। বিশ্বের প্রতিটি সম্প্রদায়-গোষ্ঠীর লোকজন ঐক্যবদ্ধভাবে আপন আপন সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে উৎসাহী। সুতরাং, জাতীয়তাবাদ এমন একটি মাধ্যম যা বৈচিত্র্যের মধ্যেও বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করে।

০৩. **স্বাধীনতা আন্দোলনে উৎসাহ দান :** জাতীয়তাবাদ এমন একটি মানসিক অনুভূতি যা পরাধীন জাতিকে স্বাধীনতা, তথা মুক্তি আন্দোলনে উৎসাহ দেয়। বিশষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর উন্নয়নশীল দেশগুলোতে স্বাধীনতার যে জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে তার পশ্চাতে অনুপ্রেরণা দানকারী শক্তি হল জাতীয়তাবাদ।

০৪. **অভ্যন্তরীণ স্থায়িত্ব বৃদ্ধি :** জাতীয়তাবাদের অন্যতম গুণ ইহা রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও স্থায়িত্বকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করে। এদিক থেকে জাতীয়তাবাদকে আদর্শ বলে অভিহিত করা ভুল নয়। জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে কোনো রাষ্ট্র বা জনসমাজ অভ্যন্তরীণ স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করতে পারে।

খ. জাতীয়তাবাদের নেতিবাচক প্রভাব

০১. **সাম্রাজ্যবাদের আশঙ্কা :** উগ্র জাতীয়তাবাদ প্রবণতা তাড়নায় অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী জাতিগুলো দূর্বল জাতিগুলোকে হেয় জ্ঞান করে পদানত করতে প্রয়াসী হয়। জাতীয়তাবাদ তখন আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে যা সভ্যতা বিকাশের জন্য সহায়ক নয়। সুতরাং উগ্র জাতীয়তাবাদ এ ধরণের উন্নতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

০২. **সংস্কৃতি বিকাশের পরিপন্থী :** জাতীয়তাবাদ ভৌগোলিক সীমারেখাকে সীমিত করে বিভিন্ন জাতি ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণের পথ রুদ্ধ করে দেয়। অথচ বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতি সংমিশ্রণের ফলেই উন্নত সংস্কৃতি গড়ে ওঠে।

০৩. **বিচ্ছিন্নতাবাদের উৎসাহ দান :** বর্তমান বিশ্বের সকল বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের মূলেই রয়েছে সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো এ সমস্যা দ্বারা জর্জরিত। বহুজাতিভিত্তিক রাষ্ট্রগুলোর বিভিন্ন জাতি কালক্রমে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ স্বীয় স্বাতন্ত্র্য সংরক্ষণে তৎপর হয়। এ জন্যে প্রয়োজনে তারা সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে যেতেও পিছপা হয়না।

০৪. **পারস্পরিক সন্দেহ ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি :** বর্তমানে জাতীয়তাবাদী চেতনা এমন একটি পরিবেশের সৃষ্টি করেছে যেখানে সন্দেহ ও দ্বন্দ্ব লেগেই আছে। প্রত্যেকটি জাতীয় রাষ্ট্র অপর প্রতিবেশি জাতীয় রাষ্ট্রকে সন্দেহের চোখে দেখে। আজকের যুগে আমরা পারস্পরিক সহযোগিতার পরিবর্তে যুদ্ধাস্ত্র তৈরিতে মগ্ন। এর পরিণতি সংঘাত আর বর্বরতার বিভীষিকা।

০৫. **অর্থনৈতিক স্বার্থের পরিপন্থী :** মুক্তবাজার অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলনের মধ্য দিয়ে। অর্থনৈতিক অঙ্গনে আজকাল আন্তর্জাতিকতার বিপুল প্রভাব লক্ষ্য করা যায় কিন্তু উগ্র জাতীয়তাবাদ এটার পরিপন্থী।

০৬. **দ্বন্দ্বের বিস্তার :** জাতীয়তাবাদ প্রসারের জন্যই পৃথিবীর এক দেশে কোন ঘটনা ঘটলে তার প্রতিক্রিয়া দেখা যায় অন্যদেশে। বিশ্বের এক সীমান্তে কোন ঘটনা ঘটলে তা সর্বত্র আলোচিত হতে থাকে। মধ্যপ্রাচ্য কোন ঘটনা ঘটলে তা প্রতিক্রিয়া দেখা যায় আমেরিকা, রাশিয়া ও চীনে। এ প্রতিক্রিয়ার ফল হিসেবেই কোন সমস্যাসংকুল দেশকে নিয়ে বর্তমান বৃহৎশক্তির মধ্যে লড়াই চলে। এটা বিশ্ব সভ্যতার জন্য শুভ নয়।

০৭. **অগণতান্ত্রিক :** জাতীয়তাবাদের উগ্র, হিংস্র ও বিভৎস প্রকাশ গণতান্ত্রিক ধ্যান, ধারণা ও সমস্ত মানবিক চেতনার পরিপন্থী। এ কারণেই এটাকে অগণতান্ত্রিক বলা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায় "Nationalism is a Menace to Civilization".

০৮. **বিশ্বশান্তির বিরোধী :** উগ্র জাতীয়তাবাদ আন্তর্জাতিক শান্তির পক্ষে ক্ষতিকর। এই রকম সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ সর্বক্ষেত্রে স্বদেশ ও স্বজনের দাবিকে অগ্রাধিকার দেয়। ন্যায়-অন্যায়, যুক্তি ও আলাপ-আলোচনা অস্বীকার করা হয় এবং সর্বপ্রকার বিরোধ মীমাংসার জন্য যুদ্ধের পথ গ্রহণ করা হয়। এই যুদ্ধবাদী প্রবণতা বিশ্বশান্তির ঘোরতর শত্রু।

০৯. **সংকীর্ণতা সৃষ্টি করে :** বিকৃত জাতীয়তাবাদ অন্ধ আবেগ ও উন্মাদনার সৃষ্টি করে। তার ফলে দেশ ও জাতির সবকিছুই একটি বাধার নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করা হয়। এভাবে বাইরের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতা সংস্কৃতির আলোতে প্রবেশের পথ অবরুদ্ধ হয়। ফলে জাতির সর্বাঙ্গীন ও বৈচিত্র্যময় উন্নতি ব্যহত হয়।

১০. **সভ্যতার সংকট তৈরি করে :** স্বদেশ ও স্বজনের প্রতি গভীর অনুরাগের ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদ জাত্যাভিমানে রূপান্তরিত হয়। নিজেদের সকল বিষয়ে উন্নত ধারণা এবং অন্য জাতির সবকিছুকে হেয় জ্ঞান করার প্রবণতা দেখা দেয়। জাতির মধ্যে এক অন্ধ আবেগের সৃষ্টি হয়। এটাই উগ্র জাতীয়তাবাদ। এভাবে বিকৃতরূপ ধারণ করে জাতীয়তাবাদ বিভিন্ন জাতির মধ্যে হিংসা, ঘৃণা ও বিদ্বেষের সম্পর্ক সৃষ্টি করে। তার ফলে সমগ্র মানব সভ্যতা সংকটের সম্মুখীন হয়।

সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ

সাম্রাজ্যবাদ : সাম্রাজ্যবাদ এমন এক রাষ্ট্রীয় নীতি যার উদ্দেশ্য হচ্ছে কোন সাম্রাজ্য সৃষ্টি, সংগঠন এবং সংরক্ষণ করা। সাধারণত অন্যজাতি বা সম্প্রদায় কর্তৃক অধিকৃত ভূ-খণ্ড, আশ্রিত এলাকা বা প্রভাবাধীন স্থান লাভ করার জন্য এবং সেখানে শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্থ বিনিয়োগগত সুযোগ-সুবিধা অর্জনের জন্য সরকারি যন্ত্র এবং কূটনীতি করাকেই সাম্রাজ্যবাদ বলে।

বৈশিষ্ট্য : সাম্রাজ্যবাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ হল-অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামরিক উদ্দেশ্য; ভূ-খণ্ড বা রাজ্য সম্প্রসারণ; শাসন করার মনোভাব; উৎপাদন ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান কেন্দ্রীকরণ; মহাজনী মূলধনের সৃষ্টি; পুঁজি রপ্তানি; বৈদেশিক বাজার নিয়ন্ত্রণ; বিশ্বের ভূ-খণ্ড বণ্টন।

উপনিবেশবাদ : উপনিবেশবাদ বা colonialism শব্দটি এসেছে ল্যাটিন Colonia থেকে যার অর্থ মানব সমাজের একটি স্থানান্তরিত অংশ। একটি দেশের লোক যখন অন্য দেশে বসবাস আরম্ভ করে এবং সেই দেশকে নিজস্ব সভ্যতা এবং সংস্কৃতি অনুযায়ী গড়ে তোলার চেষ্টা করে তখন তাকে উপনিবেশবাদ বলা হয়। রাজনৈতিক দিক থেকে উপনিবেশবাদ দুটি অর্থ বহন করে। যথা-

১. দেশের সীমান্তের বাইরে কোন রাষ্ট্রের বসতি স্থাপন।
২. মূল ভূ-খণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন কোন একটি ভূ-খণ্ড।

➘ **প্রকৃতি/ বৈশিষ্ট্য :** উপনিবেশবাদের প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য সমূহ নিম্নে আলোচনা করা হল–

০১. **সাংস্কৃতিক শোষণ :** উপনিবেশের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকর কারণ হল সাংস্কৃতিক। উপনিবেশিক শাসকগণের প্রথম লক্ষ্যই থাকে যে কোন প্রকারে কলোনিগুলোর শিক্ষা-সাংস্কৃতিক নিয়ন্ত্রণ এবং নিজেদের সংস্কৃতির প্রসার সাধন। এ জন্য তারা আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা এবং কারিগরি কৌশল উপনিবেশের অধিবাসীদের সামনে তুলে ধরে।

০২. **অর্থনৈতিক শোষণ :** উপনিবেশিক শক্তি দখলকৃত অঞ্চল হতে শিল্প কাঁচামাল অত্যন্ত কম মূল্যে নিজ দেশে নিয়ে যেতে এবং এসব কাঁচামাল থেকে তৈরি দ্রব্যাদি পুনরায় অধিকৃত অঞ্চলে অত্যন্ত বেশি দামে বিক্রি করত। এছাড়াও জনগণের উপর বিভিন্ন ধরণের কর এবং জমিদারি প্রথা প্রবর্তন করে অর্থনৈতিক শোষণ চালাতো।

০৩. **রাজনৈতিক পরাধীনতা :** উপনিবেশবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল রাজনৈতিক পরাধীনতা। কেননা সে সময় উপনিবেশগুলোতে তেমন কোন রাজনৈতিক তৎপরতা দেখা যায় না। এসব অঞ্চলের রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছিলনা। মোট কথা, অন্য দেশের উপর নিজেদের রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে তারা উপনিবেশিক স্বার্থ উদ্ধার করে।

০৪. **জাতীয়তাবাদী আন্দোলন :** একথা বলা হয় যে, বিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মূলেই রয়েছে সুদীর্ঘ উপনিবেশিক শাসনের প্রভাব। উপনিবেশিক শাসনের শেষের দিকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নেতৃত্ব ও জনগণ স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে উপনিবেশিক শক্তিকে সরানোর জন্য জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু করে। এর ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উদিত হয় স্বাধীনতার সোনালী সূর্য।

০৫. **সামরিক শোষণ :** সামরিক শক্তিকেও উপনিবেশবাদ বিস্তৃতির কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। উপনিবেশিক শাসনামলে সামরিক সংগঠন বিভিন্নভাবে তৎপরতা চালিয়েছে। উপনিবেশিক সামরিক শক্তি বৃদ্ধির জন্যও উপনিবেশগুলোকে ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ পরবর্তীতে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি এবং সামরিক বাহিনীর আয়তন বড় করার জন্য উপনিবেশিক শক্তি উপনিবেশিক এলাকা হতে লোক নিয়োগ করত।

০৬. **বৃহৎশক্তির মর্যাদা লাভ :** উপনিবেশ স্থাপনের মূলেই রয়েছে কোন জাতি বা রাষ্ট্রের বৃহৎ শক্তির মর্যাদা লাভের মনোবাসনা। উপনিবেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ভূ-খণ্ডগত গুরুত্ব এবং সামরিক বাহিনীর উপর উপনিবেশিক শক্তির মর্যাদা নির্ধারিত হয়।

০৭. **সামাজিক শ্রেণি বিভাজন :** উপনিবেশবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য বা প্রকৃতি হল সামাজিক শ্রেণিবৈষম্য বা বিভেদ। উপনিবেশিক শক্তিসমূহ প্রথমেই সচেষ্ট থাকে তাদের আজ্ঞাবাহী একটি মধ্যবিত্ত শ্রেণি সৃষ্টির জন্য। এ শ্রেণিটি উপনিবেশিক শক্তির স্বার্থে প্রতিনিধিত্ব করে।

০৮. **পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রচার :** উপনিবেশগুলোতেই উপনিবেশিক শক্তি তাদের প্রভূত্ব ও নিয়ন্ত্রণ শক্তিশালী করার জন্য সর্বাগ্রেই নিজ দেশ তথা পাশ্চাত্যের অনুকরণে শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামো তৈরি করত। তাদের অন্যতম লক্ষ্য থাকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত একটি এলিট শ্রেণি তৈরি করে এবং তাদের মাধ্যমে স্বার্থ চরিতার্থ করা।

০৯. **নিজস্ব শাসনব্যবস্থার প্রচলন :** উপনিবেশিক শক্তিগুলোর অন্যতম উদ্দেশ্য থাকে তাদের স্থাপিত উপনিবেশগুলোতে নিজেদের আদলে শাসনব্যবস্থার প্রচলন করা।

১০. **ধর্মীয় প্রভাব বিস্তার :** উপনিবেশিক শক্তিগুলো ছিল সাধারণত খ্রিস্ট অনুসারী। উপনিবেশিক শাসনামলে তাই খ্রিস্টধর্ম প্রসারের জন্য বিভিন্ন মিশনারিজ ও দাতব্য সংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হত।

STUDENT STUDY

Neo-colonialism

নব্য-উপনিবেশবাদ

নব্য উপনিবেশবাদ : নব্য উপনিবেশবাদ হল একটি দেশের উপর অন্য একটি দেশের যেকোনো ধরণের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব। এর উদ্দেশ্য হলো- ১. উন্নয়নশীল দেশগুলোকে প্রকৃত স্বাধীনতা এবং অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ থেকে বিরত রাখা; ২. পুঁজিবাদী পদ্ধতির শাসনব্যবস্থা অব্যাহত রাখা; ৩. উন্নয়নশীল দেশের কাঁচামাল থেকে সুবিধা অর্জন; এবং ৪. পুঁজি-বিনিয়োগের জন্য লাভজনক বলয় তৈরি করা এবং পণ্য বিক্রির জন্য বাজার তৈরি করাই হল নব্য-উপনিবেশিকতার উদ্দেশ্য।

বৈশিষ্ট্য

০১. **অর্থনৈতিক সাহায্য ও ঋণ :** নব্য-উপনিবেশবাদের অন্যতম মাধ্যম হল অর্থনৈতিক সাহায্য ও ঋণ। সাধারণভাবে ঋণ ও অর্থনৈতিক সাহায্যকে পররাষ্ট্রনীতি প্রয়োগের মাধ্যমরূপে প্রয়োগ করা হয়। অর্থনৈতিক ঋণ অনুন্নত এবং উন্নয়নশীল দেশের সার্বিক বিকাশকে প্রতিহত করে। অনুদানের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে গ্রহীতা দেশকে স্থায়ীভাবে নির্ভলশীল করে রাখা।

০২. **বৈদেশিক বাণিজ্য :** বৈদেশিক বাণিজ্য নব্য-উপনিবেশবাদ স্থাপনের আরেকটা হাতিয়ার। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক বাজারে তাদের মনোপলি নীতি অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশের কাছ থেকে কাঁচামাল কেনার সময় ডলারের দাম কমিয়ে দেয় এবং তাদের পণ্য রপ্তানির সময় ডলারের দাম বাড়িয়ে দেয়। এভাবে বৈদেশিক বাণিজ্যের সাহায্যে পুঁজিবাদী দেশগুলো তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোকে পদানত করে রেখেছে।

০৩. **সামরিক ঘাঁটি স্থাপন :** নব্য-উপনিবেশবাদের শোষণের আরেকটি ধরণ হল সামরিক ঘাঁটি হয় এবং সামরিক উদ্দেশ্য ঐসব ঘাঁটির ব্যবহার। এসব সামরিক ঘাঁটি শুধু উন্নয়নশীল দেশেই স্থাপিত হয়নি, উন্নত দেশেও স্থাপন করা যায়। আক্রমণাত্মক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ঐসব ঘাঁটি ব্যবহার করা হয়।

০৪. **এনজিও :** বেসরকারি আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানসমূহ যেমন- CARE, BRAC ইত্যাদি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। তারা তৃতীয় বিশ্বের বেকার সমস্যাকে পুঁজি করে দেশের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে উন্নয়নশীল দেশের শিক্ষিত বেকার যুবকদের আকৃষ্ট করে। তখন তারা সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর বিরোধীতা করার ক্ষমতা রাখে না। এভাবে যুব সমাজের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়ে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোকে পদানত করে রাখে।

০৫. **যৌথ উদ্যোগ :** নব্য-উপনিবেশিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যৌথভাবে নানা পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। অনেক সময়ই অন্যান্য নব্য-উপনিবেশিক শক্তির সাহায্য ছাড়া কোন শক্তির পক্ষে একক প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিজের প্রাধান্য বজায় রাখা সম্ভব নয়। তাই বেলজিয়াম, ফ্রান্স, গ্রেট বৃটেন, পর্তুগাল, স্পেন এবং অন্যান্য উপনিবেশিক শক্তি জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম দমনের জন্য পরস্পরকে সাহায্য করেছে।

০৬. **উপজাতীয় ও ধর্মীয় সংঘর্ষ :** নব্য-উপনিবেশিকবাদ ষড়যন্ত্রের নগ্নরূপ কখনও কখনও উপজাতীয় সংঘর্ষের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চল- কঙ্গো, কেনিয়া, ঘানা, নাইজেরিয়ার বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে সৃষ্ট সংঘর্ষ এবং জাতীয় অনৈক্য সৃষ্টি দ্বারা উপনিবেশ শক্তিগুলো নিজেদের স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করে। কোথাও বা ধর্মীয় বিবাদের সুযোগে জনগণের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তার অণুপ্রেরণা সৃষ্টি করে।

০৭. **প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে :** উন্নয়নশীল দেশগুলো প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এখনও অনেক পিছিয়ে। এ সুযোগে সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ নিজেদের প্রযুক্তি ও কারিগরি জ্ঞানকে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে হস্তান্তর করে। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য উন্নয়নশীল দেশসমূহের পরনির্ভরতা ক্রমশ বৃদ্ধি করা এবং সে সুযোগে তাদের উপর পরোক্ষ শোষণ চালিয়ে যাওয়া এবং তাদের এ প্রচেষ্টায় তারা পুরোপুরি সফল।

০৮. **পুতুল সরকার গঠন :** উপনিবেশিক শক্তি তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তাদের নিয়ন্ত্রণ টিকিয়ে রাখতে তাদেরই আজ্ঞাবাহী পুতুল সরকার গঠনের নীতি অবলম্বন করে থাকে। তারা নিজেদের মতবাদের বিরোধী সরকারের পতন ঘটানো, সামরিক অভ্যুত্থান, সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপ বা নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে সাহায্য প্রদান ইত্যাদি বিভিন্ন পর্যায়ে রাজনৈতিক আধিপত্য ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

০৯. **মুক্তবাজার অর্থনীতি :** বলা হচ্ছে বর্তমান বিশ্বের মুক্তবাজারের জয়জয়কার। বাজার অর্থনীতির কৌশলের মাধ্যমে যোগ্যদের সাথে অযোগ্যদের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ করে উপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলো উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাদের বাজার সম্প্রসারণের কৌশল অবলম্বন করে। মুক্তবাজার অর্থনীতির যাতাকলে পিষ্ট হয় উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগুলো।

১০. **নিজস্ব শিক্ষার প্রসার :** উপনিবেশিক দেশগুলো সকল প্রকার প্রগতিশীল চিন্তাধারা ও চেতনার বিরুদ্ধে তৎপর থাকে। এ জন্য তারা বিভিন্ন বৃত্তি, অর্থ সাহায্য ও ফান্ড গঠন করে বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে মেধাবী ছাত্রদের তাদের দেশে পাচার করে নিয়ে যায়। তাদের এ কৌশলের ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মেধাবী ও জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক নেতৃত্ব বিকশিত হতে পারে না।

১১. **সামরিক জোট গঠন ও চুক্তি সম্পাদন :** উন্নয়নশীল দেশগুলোর রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তারের জন্য উপনিবেশিক শক্তিগুলো এসব দেশকে বিভিন্ন সামরিক জোটও চুক্তিতে আবদ্ধ করে। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বলতার কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলো এসব জোট ও চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসতে পারে না।

১২. **সাংস্কৃতিক অঙ্গনে প্রভাব বিস্তার :** উন্নয়নশীল দেশগুলোর সাংস্কৃতিক অঙ্গনে বহুমুখী প্রভাববলয় সৃষ্টি উপনিবেশিক শক্তিগুলোর একটা বিশেষ কৌশল। এসব দেশের সাংস্কৃতিক মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়ে নিজস্ব সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ও আধিপত্য বিস্তারের জন্য শক্তিশালী প্রচারমাধ্যম যেমন- বিবিসি, সিএনএন, ভোয়া-র ন্যায় শক্তিশালী প্রচারমাধ্যমকে নিয়োজিত রাখছে।

আলোচ্য বিষয়

Post-Modernism

উত্তর আধুনিকতাবাদের ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে post modernism। অর্থাৎ আধুনিকতাবাদের পরবর্তী ধাপ হচ্ছে উত্তর আধুনিকতাবাদ। আধুনিকায়নের ফলে বিশ্বব্যবস্থার যেসব সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান করা সম্ভব হয়নি, সেসব সমস্যা সমাধানের জন্য যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় তাই উত্তর আধুনিকতাবাদ। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ইত্যাদির ক্ষেত্রে একটি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এটি মূলত উত্তর আধুনিকতাবাদের ভাষার সাথে জড়িত।

মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক রেমন্ড উইলিয়ামস তাঁর 'Key Words. A Vocabulary of culture and society' গ্রন্থে বলেছেন যে, modern শব্দটি যখন উদ্ভূত হলো তখন এটি বোঝাতো "বর্তমান"কে, "এখন"কে। তার মানে হচ্ছে, আধুনিক শব্দের সাথে ইতিহাসের ধারণা যুক্ত। উত্তর-আধুনিকতাবাদ কিন্তু আধুনিকের পরের কোন পর্বকে নির্দেশ করেনা। আধুনিকতাবাদী চিন্তকদের মতে, আধুনিকতাবাদ বা modernism হচ্ছে একটি দৃষ্টিভঙ্গী, একটি মনোভঙ্গী। উত্তর আধুনিকতাবাদ হলো এক সেট ধারণা। এর আবির্ভাব মূলত আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে একাডেমিক গবেষণার পরিসরে। উত্তর আধুনিকতাবাদ বিভিন্ন জ্ঞানকান্ড থেকে এসেছে। বিশেষভাবে বললে শিল্প, স্থাপত্য, সঙ্গীত, চলচ্চিত্র, সাহিত্য, সামাজিক বিজ্ঞান, যোগাযোগ, ফ্যাশন এবং প্রযুক্তি ইত্যাদি ক্ষেত্রে।

আধুনিকতাবাদ হলো একটি নান্দনিক আন্দোলন (aesthetic movement)। এই আন্দোলন ছিলো চিত্রশিল্প, সঙ্গীত, সাহিত্য, নাটক ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে পুরাতন ভিক্টোরিয়ান সময়কালের ধ্যান-ধারণাকে খারিজ করা হয় আর এ সকল ক্ষেত্রেই নতুন ধারার প্রবর্তন করা হয়। এ সময় ১৯১০-১৯৩০ পর্যন্ত সময়কালকে 'period of high modernism' বলা হচ্ছে। এ সময়ের তাত্ত্বিকেরা হলেন Woolf, Joyce, Eliot, Pound, Stevens, Proust, Malarme, Kafka, and Rilke যাদেরকে বিংশ শতাব্দীর আধুনিকতাবাদের প্রবক্তা বলা হয়।

আধুনিকতাবাদ এবং উত্তর-আধুনিকতাবাদের মধ্যকার সম্পর্ককে দেখবার ভিন্ন একটি দৃষ্টিভঙ্গী এ বিষয়টিকে আরও স্পষ্ট করবে। Frederic Jameson এর মতে, আধুনিকতাবাদ এবং উত্তর-আধুনিকতাবাদ হলো একটি সাংস্কৃতিক গঠন যা পুঁজিবাদের নির্দিষ্ট ধাপের সাথে জড়িত। তিনি পুঁজিবাদের তিনটি প্রাথমিক ধাপের কথা উল্লেখ করেন যা নির্দিষ্ট ধরণের সাংস্কৃতিক চর্চাকে নির্দেশ করে।

১. প্রথমটি হলো market capitalism, যা আঠার শতক থেকে শুরু হয়ে উনিশ শতকের শেষ পর্যন্ত পশ্চিম ইউরোপ, ইংল্যান্ড এবং আমেরিকাতে সংঘটিত হয়েছিলো। এই ভাগে রয়েছে প্রযুক্তিগত উন্নয়ন (steam-driven motor) এবং একটি নির্দিষ্ট ঢংয়ের নান্দকিতা যাকে বলা হচ্ছে realism।

২. দ্বিতীয়টি হলো monopoly capitalism, দ্বিতীয় ধাপের শুরু হয় উনিশ শতকের শেষ থেকে এবং যা চলছিলো বিশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত। এই ভাগে রয়েছে electric and internal combustion motors এবং আধুনিকতা।

৩. তৃতীয়টি হলো multinational or consumer capitalism, এটি হলো বর্তমান সময় যেখানে পণ্য উৎপাদনের চেয়ে পণ্য বাজারজাতকরণ, বিক্রি এবং ভোগের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। যার সাথে জড়িত পারমাণবিক এবং বৈদ্যুতিক প্রযুক্তি।

উপরোক্ত আলোচনা শেষে উত্তর-আধুনিকতাবাদের বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। এ কথাটি পরিষ্কার যে, আধুনিকতাবাদকে বোঝা ছাড়া কোনভাবেই উত্তর-আধুনিকতাবাদকে বোঝা সম্ভব নয়। বিংশ শতাব্দীর সংস্কৃতিকে বুঝতে আধুনিকতাবাদ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে উত্তর-আধুনিকতাবাদ মূলত ৮০'র দশকের। মূলত বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আধুনিকতাবাদ একটি নান্দনিক হিসেবে আবির্ভূত হয়, যা সেই সময়ের শিল্প ও সংস্কৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে।

ওয়াল্টার ওন্ডারসন বলেন, "বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে সাহিত্য, শিল্প, ইতিহাস, আইন, সংস্কৃতি ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে যে ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয় তা উত্তর আধুনিকতাবাদের ফলস্বরূপ।" বস্তুত স্যামুয়েল বেকেটকে উত্তর আধুনিকতাবাদের আলোকবর্তিকা এবং অগ্রপথিক হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। ছোট গল্পের লেখক জর্জ লুইসকে উত্তর আধুনিকতাবাদের পূর্বাবাসকারী বলা হয়ে থাকে। এছাড়া মার্টি হাইডেগার, মিশেল ফোকান্টও উত্তর আধুনিকতাবাদ নিয়ে তাদের চিন্তা-ভাবনা প্রকাশ করেছেন।

উত্তর আধুনিকতাবাদ বিশ্বব্যবস্থায় এক পরিবর্তনের সূচনা করে। বিশ্বায়নের প্রভাবে সরকার ও রাজনীতি ব্যবস্থায় ব্যপক উন্নতি ঘটে। বিশ্ব রাজনীতিতে গনতন্ত্রের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটে। জীবনযাত্রার মানের ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। সারা বিশ্বের মানুষের মধ্যে যোগাযোগ দৃঢ় হয়। বিশ্বায়নের জাহাজে চেপে পৃথিবী এগিয়ে চলে দ্রুতগতিতে।

আলোচ্য বিষয়

Globalization

বিশ্বায়ন

বিশ্বায়ন : বিশ্বকে সীমানামুক্তকরণ ও আন্তর্জাতিকীকরণের মাধ্যমে মুক্ত বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষিতে অর্থ ও সম্পদের অবাধ প্রবাহ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একত্রীকরণ এবং বিশ্ব বাণিজ্যে উদারীকরণের প্রক্রিয়ার নাম বিশ্বায়ন। বিশ্বায়ন কোনো একক প্রক্রিয়া নয় বরং এটি একটি সর্বব্যাপী ও সার্বিক প্রক্রিয়া। বিশ্বায়ন রাষ্ট্রীয় সীমানার প্রাচীর ভেঙ্গে অর্থনৈতিক যোগাযোগ লেনদেন, সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান, রাজনৈতিক মিথস্ক্রিয়া প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই একটি বৈশ্বিক অবকাঠামো তৈরি করেছে।

বর্তমানে যে 'বিশ্বায়ন' -এর কথা মুখে মুখে শোনা যাচ্ছে এর সূচনা হয় সংস্কারবাদী সোভিয়েত নেতা মিখাইল গর্ভাচেভ-এর 'পেরেস্ত্রৈকা' (Perestroika) এবং 'গ্লাসনস্ত' (Glasnost) নীতি থেকে, যেখানে গর্বাচেভ চেয়েছিলেন বিশ্ব ব্যবস্থার পুন:সংস্করণ, উদারনীতি, নতুনভাবে বিশ্বচিন্তা, সকলের জন্য শান্তি, বৃহৎশক্তির মধ্যে সহযোগিতা এবং স্নায়ুযুদ্ধের লড়াইয়ের পরিসমাপ্তি।

বিশ্বায়নের সংজ্ঞা

বিশ্বায়ন হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যার ফলে বিশ্বের সকল জাতিরাষ্ট্রগুলো অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। Globalization-এর কয়েকটি উল্লেখ্যযোগ্য সংজ্ঞা নিম্নরূপ :

- Anthony McGraw এর মতে, "Globalization is a process which generates flows and connections, not simply across the nation state and national territorial boundaries, but between global regions, continents and civilization."
- Martin Albrow বলেছেন, "Globalization is all the processes by wich the peoples of the world are incorporated into a single society."
- Anthony Giddens বলেছেন, "Globalization is the intensiification of world wide social relations" মূলত: Globalization হচ্ছে অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিস্তার ও তথ্য প্রযুক্তির বিকাশের ফলে বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠে। বর্তমান বিশ্বের সকল রাষ্ট্রই এ বিশ্বায়নের প্রক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত।

বিশ্বায়নের উদ্ভব

১. **উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা :** গতিশীল যোগাযোগ, উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা, ক্রমবর্ধমান আর্থিক সঞ্চালন এবং দ্রুত প্রযুক্তিগত উন্নয়নের ফলে সময় ও দূরত্বের ব্যবধান এতই হ্রাস পেয়েছে যে, একটি বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রাপেন্ত বিচরণ বর্তমানে কোনো কষ্টসাধ্য ব্যাপারই নয়।

২. **দেশীয় বাজারের অপার্যাপ্ততা :** বৃহৎ কোম্পানিগুলো কাছে নিজ দেশীয় বাজার ছোট ও অপর্যাপ্ত বলে প্রতীয়মান হতে পারে। যে সকল দেশের নিজস্ব বাজার খুবই ছোট সে সকল দেশে সৃষ্ট বৃহৎ কোম্পানি আচিরেই বর্হিবিশ্বে বাণিজ্য প্রসার ঘটাতে বাধ্য হয়।

৩. **আকর্ষণীয় পণ্যে বাজার বিস্তৃতি :** যে কোনো আকর্ষণীয় পণ্যের বাজার সহজেই এক দেশে থেকে অন্য দেশে পরিব্যপ্ত হয়। উদারহরণ স্বরূপ কোকালোল বা টয়োটা গাড়ির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে।

৪. **সস্তা শ্রম ও কাঁচামাল ব্যবহার :** উন্নত বিশ্বে শ্রম ও কাঁচামাল ব্যয়বহুল বিধায় অনেক বড় কোম্পানি গ্লোবাল কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে সস্তা শ্রম ও কাঁচামাল ব্যবহারের সুযোগ গ্রহণে আগ্রহী হয়।

৫. **বিক্রয় ও মুনাফা বৃদ্ধি :** অনেক ক্ষেত্রে হাইটেক শিল্প-কারখানা তাদের গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে এত সময় ব্যয় করে যে, তাদের উৎপাদন ব্যয় সাশ্রয়ের জন্য বিক্রয় বৃদ্ধি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে দুনিয়াব্যাপী বাজার সম্প্রসারণ তৎপর হওয়া ছাড়া তাদের উপায় থাকে না।

৬. **বিনিয়োগের ঝুঁকি হ্রাস :** কোনো একক দেশে বিনিয়োগ অনেক সময় ঝুঁকিপূর্ণ বলে বিবেচিত হতে পারে। এরূপ ঝুঁকি এড়ানোর লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশে বিনিয়োগ ও উৎপাদনের সিদ্ধান্ত সুফল বয়ে আনতে পারে।

৭. **পরিবহন ব্যয় হ্রাস :** অনেক কোম্পানি পরিবহন ব্যয় হ্রাসকল্পে বর্হিবিশ্বে উৎপাদন সম্প্রসারণের সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকে। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পণ্য পরিবহন নিঃসন্দেহে ব্যয়সাধ্য। সুতরাং, পরিবহন ব্যয় যাতে কোনো দেশে পণ্যের অযথা মূল্যবৃদ্ধির কারণ না ঘটায় সে লক্ষ্যে ঐ দেশের বহুজাতিক কোম্পানি সমূহ পণ্যের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করে।

৮. **বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার উদ্ভব :** World Bank, WTO, IMF, ASEAN ইত্যাদি আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের মাধ্যমে বিশ্বায়ন প্রক্রিয়া যে বহু গুণে ত্বরান্বিত হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বিশ্বায়নের মাত্রাসমূহ / ব্যাপ্তি

ক. আর্থ-সামাজিক মাত্রা

১. **ব্যবসা-বাণিজ্য :** বিশ্বায়নের মূল চালিকাশক্তিই হলো ব্যবসা-বাণিজ্য। ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য বিভিন্ন শুল্ক ও অশুল্ক বাধা দূরীকরণের চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়গুলো সহজ করে দিয়েছে। এর ফলে ধনী দেশগুলো শিল্প পণ্য রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা পূরণের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পদ্ধতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তদুপরি, বহুজাতিক কোম্পানিগুলো এখন তাদের পুঁজি বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে বিনিয়োগ শুরু করেছে।

২. **পুঁজি প্রবাহ :** উন্নত অর্থনীতিগুলো এতদিন যাবৎ সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগের অবধারিত গন্তব্য হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছিল। উদীয়মান অর্থনীতির দেশগুলোতেও এ প্রবাহ ছিল লক্ষ্যণীয়। কিন্তু বিশ্বায়নের এ সময়ে সে স্রোতধারা যেন পুরোপুরি উল্টে গেছে। মাত্র কয়েক বছর আগেও কেউ ভাবতে পারেনি যে সাবেক ব্রিটিশ স্টিল কোম্পানি দক্ষিণ এশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকার মতো এলাকায় বিনিয়োগের জন্য মরিয়া হয়ে উঠবে।

৩. **বিশ্ব বিপনন প্রতিযোগিতা :** বিশ্বায়নের ফলে পণ্যের চাহিদার সাথে সাথে বেড়েছে পণ্যের বিপণনও। এই ক্রমবৃদ্ধি জন্ম দিয়েছে বিপণন প্রতিযোগিতা। প্রতিটি পণ্যের উৎপাদকরা এখন তার পণ্যের বিপণনের জন্য যেমন বিশ্ব বাজার পেয়েছে, তেমনি তাদের পণ্যের জন্য বিপণন খরচও বেড়েছে বহুগুনে।

৪. **অর্থনৈতিক গতিপথের নতুন মানচিত্র :** যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও ইউরোপ বিশ্ব অর্থনীতিতে তাদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব হারিয়েছে। এমনকি গবেষণা ও উন্নয়ন এবং নতুন নতুন ভোগ্য পণ্যসামগ্রী তৈরি ও চমকপ্রদ সেবাসমূহ আবিষ্কারের বিষয়টিও আজ তাদের একক কর্তৃত্বে নেই। উদীয়মান বাজারগুলো এখন দ্রুত প্রসার লাভ করেছে। আর এগুলো জোরদার হচ্ছে দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিনিয়োগের মাধ্যমে, উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তিগুলোর শিল্পকারখানায় প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে এবং নতুন নতুন প্রযুক্তি ও কৌশল ও গ্রহণের ত্বরিত গতির কারণে।

৫. **মেধা পাচার :** প্রতিভা বা মেধা ও দক্ষ শ্রমশক্তি বৈশ্বিক সম্পদে পরিণত হয়েছে। আর এ সম্পদের দখল নিয়ে লড়াইয়ে নেমেছে বহু প্রতিযোগী। পশ্চিমা বিশ্বের অর্থনীতি বয়োবৃদ্ধ কর্মী এবং শ্রম স্বল্পতায় ভুগছে। উন্নয়নশীল দেশগুলোয় জনসংখ্যার বিপুল বৃদ্ধির ফলে বিশ্বের শ্রম শক্তির ভারসাম্যও তাদের দিকেই ঝুঁকি পড়েছে। ফলে অনুন্নত বিশ্ব মেধা পাচার সমস্যায় ভুগছে।

৬. **ধনী-দরিদ্র বৈষম্য বৃদ্ধি :** বিশ্বায়নের ফলে দিন দিন ধনী-দরিদ্র বৈষম্য বেড়েই চলছে। ১৯১৩ সালে যেখানে দরিদ্রের শতকরা হার ছিল ১৩ ভাগ, ২০১৫-এ এসে তা দাঁড়িয়েছে ৮৯.১ ভাগ।

৭. **পরিবেশ ব্যবস্থা :** উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রাকৃতিক জ্বালানি তেল ও গ্যাস ব্যবহারের হার বৃদ্ধি পাওয়ায় পরিবেশও দিন দিন ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। আবহাওয়া দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, খরা, দাবানল, বিশ্বে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। ফলে প্রতিবছর ঘটেছে অসংখ্য প্রাণহানি।

খ. রাজনৈতিক মাত্রা

১. **আন্তর্জাতিকতাবাদ :** সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব প্রতিষ্ঠার পরই পৃথিবীতে আন্তর্জাতিকতাবাদ চেতনা স্পষ্ট হয়ে উঠলেও স্নায়ুযুদ্ধের রূঢ় বাস্তবতা দেশে দেশে, মানুষে মানুষে, সন্দেহ, অবিশ্বাস ও বিভেদ বাড়িয়ে দেয়। বাড়িয়ে দেয় উত্তেজনা। গানবোট ডিপ্লোমেসি, স্টার ওয়ার পৃথিবীর জন্য মহাবিপর্যয় ডেকে আনতে থাকে। বিশ্বশান্তি এসে দাঁড়ায় হুমকির মুখে। স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর মানুষে মানুষে, দেশে দেশে সন্দেহ অবিশ্বাস কমে এসেছে। গড়ে উঠেছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন, চালু হয়েছে অভিন্ন মুদ্রা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় গড়ে উঠেছে আসিয়ান (ASEAN), আফ্রিকায় আফ্রিকান ইউনিয়ন (AU) এবং দক্ষিণ এশিয়ায় SAARC প্রভৃতি। বৃদ্ধি পেয়েছে সহযোগিতাও লেনদেন। বিলুপ্ত হয়েছে একলা চলার দিন।

২. **সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি :** প্রতিটি শক্তিধর দেশের জাতীয় বাজেটের একটা বৃহৎ অংশ সামরিক খাতে বরাদ্দ করা হচ্ছে। আর সেক্ষেত্রে শীর্ষে রয়েছে গণচীন। অস্ত্র ক্রয়ে ব্যয় হচ্ছে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার, যাতে বর্তমানে শীর্ষ দেশ ভারত। অস্ত্র বিক্রিতে শীর্ষ অবস্থানে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাদার অব অল বোম্ব (The Mother of All Bombs) এর বিপরীতে রাশিয়া তৈরি করেছে ফাদার অব অল বোম্ব (Father of All Bombs- FOABs)-এ যেন অস্ত্রের প্রতিযোগিতা।

৩. **একমেরুভিত্তিক বিশ্ব ব্যবস্থা :** স্নায়ুযুদ্ধের অবসানের পর বিশ্ব পরিণত হয়েছে একমেরু ভিত্তিক বিশ্বে। এ মেরুর ধারক ও বাহক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বিশ্বায়নের গতি ত্বরান্বিত করেছে একমেরুভিত্তিক বিশ্ব ব্যবস্থা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মোড়লের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। শক্তির ভারসাম্য ভেঙে একক শক্তির উত্থান ঘটেছে।

৪. **বহুজাতিক কোম্পানির দৌরাত্ম্য :** উন্নত দেশের বহুজাতিক কোম্পানি গুলো অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে পুঁজি বিনিয়োগ করে ধীরে ধীরে ঐ সকল দেশের অর্থনীতিতে গ্রাস করে নিয়েছে। ঐ সকল দেশের রাজনীতিকে নিজেদের মতো করে পরিচালিত করছে।

৫. **অপরাধ :** বিশ্বায়ন অপরাধের বহু সুযোগ খুলে দিয়েছে। মাদক ব্যবসাকে পরিণত হয়েছে বিশ্ব বাণিজ্যে। গরীব, অনুন্নত দেশ থেকে নারী পাচার এখন জমজমাট শিল্পে রূপ নিয়েছে। প্রতিবছর পূর্ব ইউরোপের ৫ লাখ নারী পশ্চিম ইউরোপে নিয়ে দেহ ব্যবসায় নিয়োগ করা হয়। তৈরি হয়েছে অপরাধী চক্রের এক গ্লোবাল নেটওয়ার্ক। দক্ষিণ আফ্রিকার দামি গাড়ি হাইজ্যাক করে তা মস্কোয় নিয়ে বিক্রি করা হচ্ছে। ইউক্রেনের কোনো মেয়েকে সারা জীবনের জন্য পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ করা হচ্ছে। আফগানিস্তানের সীমান্তে অস্ত্র ব্যবসা জমজমাট হয়ে উঠেছে।

গ. **সাংস্কৃতিক মাত্রা**

১. **কৃষি ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে অগ্রগতি :** বিশ্বায়ন কৃষিক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছে। লাঙ্গল-জোয়াল-মই দখল করে নিচ্ছে ট্রাক্টর, পাওয়ার টিলার। পানি সেচ যন্ত্র হিসেবে দোন বা সেঁওতি ব্যবহার না হয়ে স্যালো মেশিন ব্যবহৃত হচ্ছে। কৃষি জমিতে রাসায়নিক সার ব্যবহারে ব্যবহারে উৎপাদন বহুগুণে বৃদ্ধি পেলেও জমি দিন দিন উর্বরতা শক্তি হারিয়ে ফেলছে। রাসায়নিক সারের প্রভাবে হারিয়ে যাচ্ছে নানা প্রজাতির মাছ।

২. **চিকিৎসা ক্ষেত্রে অগ্রগতি :** আগের মানুষ অশিক্ষিত ছিল বিধায় পীর-ফকিরের ঝাঁড়-ফুঁক, পানি পড়া, তাবিজ-কবজ, মানত-দান দক্ষিণায় বিশ্বাস করে আপদ-বিপদ থেকে মুক্তি লাভের চেষ্টা করতো। কিন্তু এখন শিক্ষিত হওয়ার কারণে ডাক্তারের কাছে যায়। আগের দিন কলেরা-বসন্তে গ্রামময় উজাড় হয়ে যেত। এখন কলেরা-বসন্ত মামুলি রোগে পরিণত হয়েছে। তবে এখন নতুন নতুন রোগ এইডস বার্ড ফ্লু ইত্যাদি দেখা দিয়েছে।

৩. **পরিবার ব্যবস্থা :** আগে পরিবার ছিল যৌথ। এখন দিন দিন একক পরিবার ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। আগে স্বামী-স্ত্রীর প্রেম-ভালোবাসা গভীর থাকলেও এখন এ বন্ধন শিথিল হয়েছে। সামান্য কারণেই ভুল বোঝাবুঝিতে একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

৪. **ভাষা পোশাক-পরিচ্ছদের ধরণ পরিবর্তন :** দিন দিন আকাশ সংস্কৃতির এ যুগে এক ভাষা অন্য ভাষার মধ্যে ঢুকে পড়েছে। মানুষ নিজেকে স্মার্ট করার জন্য ইংরেজি, হিন্দি, আরবি, ফরাসি ভাষার মিশ্রণ ঘটিয়ে জগাখিচুড়ি ভাষার উদ্ভব ঘটাচ্ছে। বিশ্বায়ন পোশাক-পরিচ্ছদে এনছে বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এখন নারীরা সেলোয়ার কামিজ, ওড়না, শাড়ি, ব্লাউজ ছেড়ে জিনস্, টি-শার্টের দিকে ধাবিত হচ্ছে। ধর্মীয় মূল্যবোধের দিন দিন অবনতি ঘটছে। গুরুজন ভক্তি নতুন প্রজন্মের কাছে বিকৃত রূপ ধারণ করেছে।

৫. **শিক্ষা ও খেলাধুলা :** বিশ্বায়নের প্রভাবে শিক্ষা রূপান্তরিত হচ্ছে পণ্যে। মেধাস্বত্ব ও বুদ্ধিভিত্তিক সম্পত্তির পেটেন্ট বহুজাতিক কোম্পানিগুলো কিনে নিচ্ছে। যার ফলে কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উৎপাদনক্ষম হচ্ছে না। পাশ্চাত্যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভীড় বেড়ে গেছে। বিশ্বায়ন খেলাধুলার ক্ষেত্রে এক অভূত পরিবর্তন ঘটিয়েছে। ক্রিকেট, হকি, ব্যাডমিন্টন, দাবা, বাস্কেটবল, ভলিবল, টেবিল টেনিস, লন টেনিস এখন বিশ্বের সর্বত্র চলছে। জার্মানির গুটেনবার্গে টাইপরাইটার আবিষ্কার যেমন রেনেসাঁ ঘটিয়েছে তেমনি বিশ্বায়ন খেলাধুলায় বিশ্বে রেনেসাঁ ঘটিয়েছে।

উন্নয়নশীল / স্বল্পোন্নত দেশ সমূহে বিশ্বায়নের প্রভাব

ক. ইতিবাচক প্রভাব

১. **আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়ন :** বিশ্বায়নের প্রভাবে বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক জোরদার হচ্ছে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলো একে অপরের ওপর নির্ভরশীল হচ্ছে। বিভিন্ন মাত্রাভেদে এ পারস্পারিক নির্ভরতাই বিশ্বায়নের পক্ষে একটি বড় সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করছে।

২. **বৃহদায়তন কর্মকাণ্ডের সুবিধা :** বিশ্বায়নের ফলে যে বৃহৎ বাজার ব্যপ্তি হয়েছে, তাতে বৃহদায়তন উৎপাদন ও বিপনন সহজসাধ্য হয়েছে। এতে একদিকে হ্রাস পাচ্ছে উৎপাদন ব্যয়, অন্যদিকে বৃদ্ধি পাচ্ছে মুনাফার পরিমাণ।

৩. **ভৌগোলিক শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়ন :** বিশ্বায়নের ফলে ভৌগলিক শ্রমবিভাগ ও বিশেষায়নের ক্ষেত্রে প্রসারিত হচ্ছে। ফলে প্রতিটি দেশ তার আপেক্ষিক সুবিধা অনুযায়ী উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত থাকতে পারছে।

৪. **গ্লোবাল ভাবমূর্তি উন্নয়ন :** গ্লোবাল পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের ফলে সর্বত্র পণ্যের একই রূপ ভাবমূর্তি সৃষ্টি হয়। এতে পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে উদাহরণস্বরূপ, বলা যেতে পারে, কোকাকোলা বা পেপসির এ জাতীয় গ্লোবাল ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছে যার ফলে বিশ্বব্যাপী এদের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে।

৫. **জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা স্থানান্তর :** কথায় বলে, "Think globally, act locally" অর্থ্যাৎ 'চিন্তা করুন বিশ্বব্যাপী, কাজ করুন কাছাকাছি'। বর্তমান বিশ্বে এর ব্যতিক্রম হচ্ছে না। বিশ্বের উন্নত দেশসমূহে যে জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার উন্নয়ন সাধিত হচ্ছে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে অন্যান্য দেশ সহজেই নিজেদের সমৃদ্ধ করতে পারছে। কারণ বিশ্বায়নের প্রভাবে বর্তমানে বিশ্ব জ্ঞানভাণ্ডার সকলের জন্যই উন্মুক্ত।

৬. **অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি :** বিশ্বায়নের ফলে দেশের অবাধ বাণিজ্য সহজসাধ্য হয়েছে। ই-কমার্সের বদৌলতে আলাদা মাত্রা ও গতি সঞ্চারিত হয়েছে এ অবাধ বাণিজ্যে। পৃথিবীর এক প্রান্তে বসে অন্য প্রান্তের সাথে ব্যবসায়র কাজ অতি দ্রুত সমাধান করা এখন কোনো কঠিন ব্যাপার নয়।

৭. **আন্তর্জাতিক সংঘাত হ্রাস :** বিশ্বায়নের ফলে বিশ্বায়ন দেশগুলো একে অপরের ওপর বিভিন্নভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। বর্তমানে কোনো দেশই নিজেকে আলাদাভাবে চিন্তা করতে পারে না। এতে যে বিশ্বায়নের বন্ধন রচিত হয় তা আন্তর্জাতিক সংঘাত হ্রাস গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে।

৮. **বিশ্বব্যাপী সুস্থ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তৈরি :** বিশ্বায়নের অর্থ নিজের সম্পদ বিশ্বের কাছে তুলে দেয়া নয়, বরং বিশ্বের সম্পদ নিজের কাজে লাগানো। এ কারণে পৃথিবীর যে দেশ যত উন্নত সে দেশ বিশ্বায়ন থেকে বেশি উপকৃত। বস্তুকে বিশ্বায়নেই পারে বিশ্বব্যাপী একটি সুস্থ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে তৈরি করে সমগ্র বিশ্বকে একটি উন্নত 'বিশ্বগ্রামে' রূপান্তরিত করতে।

খ. নেতিবাচক প্রভাব

১. **অর্থনৈতিক শোষন ও মেধাপাচার :** মুক্ত বাজার অর্থনীতির আওতায় বিশ্বায়ন উন্নত দেশের জন্য বিশ্বসম্পদের দ্বার খুলে দিলেও দরিদ্র বা পশ্চাৎপদ দেশের জন্য তা বড় অভিশাপস্বরূপ। বিশ্বায়নের ফলে দরিদ্র দেশের মেধা ও সম্পদ অবাধে পাচার হচ্ছে ধনী দেশে। এতে গরিব দেশ হচ্ছে আরো গরিব, আর ধনী দেশ হচ্ছে আরো ধনী।

২. **অসম প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি :** বিশ্বায়নের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মাঝে অসম প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। যে সকল দেশ শিল্প ও বাণিজ্যে দুর্বল যে সকল দেশ শিল্পোন্নত দেশের আগ্রাসনের শিকারে পরিণত হচ্ছে। শিল্পে পশ্চাৎপদ দেশসমূহের বহু শিল্প প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফলে বেকার হচ্ছে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক।

৩. **রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা উন্মুক্ত :** বিশ্বায়নের ফলে দরিদ্র দেশগুলোর পক্ষে তাদের রাষ্ট্রীয় গোপনীয়তা রক্ষা করাও একটি দু:সাধ্য ব্যাপারে পরিণত হচ্ছে। ইন্টারনেট, ই-মেইল, ফ্যাক্স ইত্যাদির মাধ্যমে যে কোন গোপনীয় দলিল, সংবাদ, তথ্য অতিদ্রুত বিদেশি প্রতিপক্ষের হাতে চলে যেতে পারে। এক্ষেত্রেও পশ্চাৎপদ দেশগুলোই মার খাচ্ছে ধনী দেশগুলোর কাছে।

৪. **শিক্ষা ব্যবস্থায় বিপর্যয় :** বিশ্বায়ন শিক্ষা ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে গরিব দেশগুলোর বিরুদ্ধে আগ্রাসী ভূমিকা পালন করেছে। উন্নত বিশ্বের শিক্ষা ও প্রযুক্তি উন্নত বিধায় অনুন্নত দেশসমূহকে তা থেকে উপকৃত হওয়ার ক্ষেত্রে যেমন ব্যয় করতে হচ্ছে প্রচুর অর্থ, অন্যদিকে ভেঙে পড়ছে তাদের নিজস্ব শিক্ষা ব্যবস্থা ও প্রযুক্তির ভিত্তি।

৫. **সাংস্কৃতিক বিপর্যয় :** বিশ্বায়নের ফলে সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও তৈরি হচ্ছে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি। ধনী দেশসমূহের অপসংস্কৃতির শিকারে পরিণত হচ্ছে উন্নয়নশীল দেশের যুবশ্রেণি। ফলে উন্নয়নশীল দেশসমূহের নিজস্ব সংস্কৃতি ক্রমে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে।

৬. **বেকার সমস্যা বৃদ্ধি :** বিশ্বায়নের ফলে উৎপাদন ব্যবস্থায় উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারে ফলে তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশে শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। ফলে এসব দেশে ভয়াবহ বেকারত্ব দেখা দিচ্ছে।

বিশ্বায়নের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল দেশগুলোর করণীয়

উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বিশ্বায়নের তীব্র প্রতিযোগিতা মোকাবেলা করে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে হলে কতগুলো নীতি-নির্ধারণী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। যেমন-

ক. রাষ্ট্রের ভৌত কাঠামো উন্নয়ন, বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তির কাজে লাগে তেমন অবকাঠামো (যেমন- টেলিযোগাযোগ বা তথ্য-হাইওয়ে) উন্নয়নে বিশেষ যত্নবান হতে হবে।

খ. সামাজিক খাতে দক্ষ বিনিয়োগ করে যেতে হবে। অবহেলিত মানুষের কর্মদক্ষতা বাড়ানোর প্রয়োজনে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা খাতে বিনিয়োগ বাড়িয়ে যেতে হবে। এই বিনিয়োগ যাতে দক্ষতার খরচ হয় তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। দারিদ্র্য নিরসনে বিশেষ যত্নবান হতে হবে।

গ. তথ্যপ্রযুক্তির উন্নয়নে উৎসাহ ও বিনিয়োগ বাড়িয়ে যেতে হবে। শিল্পায়নের স্থবিরতা দূর করে কৃষি ও প্রযুক্তিনির্ভর শিল্পায়নে মনোযোগ দিতে হবে। ক্ষুদে উদ্যোক্তা, বিশেষ করে শিক্ষিত বেকারদের প্রযুক্তিনির্ভর শিল্পায়নে মনোযোগ দিতে হবে।

ঘ. সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্থানীয় শাসনের গুণগত মান বাড়াতে হবে।

ঙ. দুর্নীতিমুক্ত আইনের শাসন ও জবাবদিহিতাসম্পন্ন সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

চ. পরিবেশ সচেতন কর্মপরিধি বাড়িয়ে রাষ্ট্রকে মানবিক উন্নয়নে নেতৃত্ব দিতে হবে।

বিশ্বায়ন ও বাংলাদেশ

বিশ্বায়নের ফলে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলো যেমন- নানাবিধ সুবিধা পাচ্ছে, একই সাথে এ দেশগুলোকে নানাবিধ অসুবিধার মুখোমুখিও হতে হচ্ছে।

সুবিধা : বিশ্বায়নের ফলে বাংলাদেশের সুবিধা সমূহ নিম্নরূপ-

১. বিশ্বায়ন বাংলাদেশকে উন্নত প্রযুক্তি পেতে সহায়তা দিচ্ছে। যার ফলে বাংলাদেশ উন্নত বিশ্বের নানা সুবিধা সহজেই পেয়ে যাচ্ছে।

২. বিশ্ব বাণিজ্যে নিজেদের পণ্য রপ্তানি এবং আমদানিতে সক্ষম হচ্ছে।

৩. বিশ্বব্যাপী উদ্ভাবিত নানা বিষয়ের সাথে পরিচিতি হচ্ছে।

৪. নতুন নতুন প্রযুক্তির সাথে পরিচিত হওয়ার ফলে গোটা বিশ্বের সাথে যোগাযোগ করতে সক্ষম হচ্ছে।

৫. বাংলাদেশের যে বিশাল জনসম্পদ রয়েছে তা সঠিকভাবে ব্যবহারের জন্যে যে জ্ঞান ও প্রযুক্তি দরকার তা তরুণ সমাজ খুব সহজেই রপ্ত করতে পারছে।

৬. দেশের গণতন্ত্র ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ করার জন্য খুব সহজেই বাহিরের অভিজ্ঞতাগুলো কাজে লাগাতে পারছে।

৭. বিশ্বায়নের ফলে বিশ্বে যে বিশাল জনশক্তি প্রয়োজন হচ্ছে, তার একটি উৎস হতে পারে বাংলাদেশ।

মোটকথা, বিশ্বায়নের ফলে আধুনিক যুগের নানা সুবিধা সহজেই বাংলাদেশের মানুষের দোর গোড়ায় এসে যাচ্ছে।

অসুবিধা

বিশ্বায়নের নানা অসুবিধাও বাংলাদেশকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে-

১. বিশ্বায়নের ফলে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলো উন্নত বিশ্বের পণ্যের বাজারে পরিণত হচ্ছে। ফলে, নিজস্ব শিল্পায়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

২. বিদেশিদের উপর প্রযুক্তি নির্ভরতা বেড়ে যাচ্ছে।

৩. বিশ্ব বাণিজ্যে উন্নত বিশ্বের নিয়ন্ত্রন শক্তিশালী হচ্ছে, যার ফলে বাংলাদেশের মত দেশগুলো খুবই কম সুবিধা নিতে পারছে।

৪. উন্নত বিশ্বের জীবনযাত্রা আমাদের সামাজিক স্থিতিশীলতাকে আঘাত করছে।

৫. বিশ্বায়নের যুগে শিল্পায়নের ফলে পরিবেশের যে বিপর্যয় ঘটছে তার প্রধান ক্ষতিগ্রস্থ দেশ হলো বাংলাদেশ।

৬. বিশ্বায়নের ফলে বৈশ্বিক প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, এ প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা বাংলাদেশের মত দেশগুলোর জন্যে বেশ জটিল হয়ে পড়ছে।

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশগুলোকে বিশ্বায়নের যুগে নিজেদের সক্ষমতা ধরে রাখার জন্য মানব সম্পদ উন্নয়নের কোন বিকল্প নেই। দীর্ঘ মেয়াদে সঠিক সিদ্ধান্ত বাংলাদেশকে বিশ্বায়নের অনেক সুবিধা পেতে সহায়তা করবে।

আলোচ্য বিষয়

The new World order

পৃথিবীতে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা এবং মানবকল্যাণের জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেই গঠিত হয় জাতিসংঘ (United Nations Organization)। জাতিসংঘ সনদে পৃথিবীর সকল দেশের সম অধিকারের মাধ্যমে ব্যাপকভিত্তিক অংশগ্রহণ ও সেবা প্রদানের কথা নিশ্চিত করা হয়। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য কাজ করার দায়িত্ব জাতিসংঘকে প্রদান করা হয়। ধারণা করা হয়েছিল যে পূর্বের বিশ্বব্যাপী দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের অবসান হয়ে পৃথিবীর শান্তি রক্ষা ও সমৃদ্ধির নিয়ন্ত্রণভার জাতিসংঘের এবং তা হবে এককেন্দ্রিক। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে দ্বি-মেরু প্রবণতার সৃষ্টি হয়। পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশ বৃহৎ শক্তি পুঁজিবাদী এবং সমাজকতান্ত্রিক শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়ে। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যথাক্রমে সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী শিবিরের নেতৃত্বে দিতে থাকে। এই দ্বিমেরুকরণ প্রবণতাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের সামরিক ও অর্থনৈতিক জোট গঠিত হয়। যেমন যুক্তরাষ্ট্রের নেতত্বে গঠিত হয় ন্যাটো (NATO), সিয়াটো (SEATO), সেন্টো (CENTO) এবং সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন তথা রাশিয়ার নেতৃত্বে গঠিত হয় ওয়ারশ জোট (WARSAW PACT), কমিকন (COMECON) ইত্যাদি। ফলে দুটি রাষ্ট্র পৃথিবীকে দুটি পরস্পর বিরোধী শিবিরে পরিণত করে রেখেছিলো।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দুই জোটের মধ্যে কঠোর বিভক্তি দেখা দেয়। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে তীব্র বিরোধ দেখা দেয়। ফলে বিশ্বের সমাজতান্ত্রিক প্রভাবের বিস্তৃতিকে প্রতিরোধ করতে মার্কিন জোট সচেষ্ট হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দু'টি পরস্পর বিরোধী রাষ্ট্রজোট প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ না হলেও সর্বদা যুদ্ধাংদেহী মনোভাব বজায় রাখতো এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে Proxi War পরিস্থিতি বিরাজ করতে। এ অবস্থায় পৃথিবীর নিয়ন্ত্রণভার আর জাতিসংঘের হাতে ছিলো না। দুই পরাশক্তি এবং তাদের নিয়ন্ত্রিত জোটই পৃথিবীর রাজনৈতিক বিষয়াদিকে নিয়ন্ত্রণ করতো। অনেক সময়ই জাতিসংঘকে নিরব দর্শকের ভূমিকা পালন করতে হতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা সৃষ্টির ফলে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে। জাতিসংঘের মাধ্যমে তেমন কোন ভূমিকা পালন করতে না পারায় এরা জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন (Non Aligned Movement)-এর পতাকাতলে আবদ্ধ হয়। এই শক্তিটি দুই পরাশক্তির দ্বন্দ্ব ও প্রভাব বলয়ের বাইরে থেকে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির জন্য কাজ করতে থাকে। সুতরাং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিশ্ব ব্যবস্থায় এই জোট একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সমর্থ হয় এবং এদিক থেকে বিশ্বব্যবস্থাকে ত্রি-মেরুকেন্দ্রিক হিসেবে অভিহিত করা হয়। এ সময়কার বিশ্ব ব্যবস্থায় বিভিন্ন আঞ্চলিক জোট গঠিত হলেও সেগুলোর গঠন বা কার্যক্রম কোন না কোনভাবে দুই পরাশক্তির প্রভাব প্রতিপত্তি দ্বারা প্রভাবিত হতো।

স্নায়ু যুদ্ধের (Cold war) অবসান এবং ১৯৯১ সালের ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে বিশ্ব ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছ। নতুন বিশ্ব ব্যবস্থাটির প্রকৃত স্বরূপ ভবিষ্যতে কি হতে পারে তা এখন পর্যন্ত রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকগণ সঠিকভাবে নির্ধারণ করতে পারেন নি। বর্তমান পর্যায়ে বিরাজমান বিশ্বব্যস্থাকে একটি আন্তর্বতীকালীন ও Transition Period হিসেবে বর্ণনা করাই যুক্তিযুক্ত। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ :

১. বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক চেতনা ও শাসনব্যবস্থার সম্প্রসারণ।
২. সামরিক অর্থনৈতিক দিক থেকে পরাক্রমশালী একক সুপার পাওয়ার হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান।
৩. সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে যাওয়ার পর যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে না হলেও অন্যতম বৃহৎ শক্তি হিসেবে চীনের অবস্থান।
৪. ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের সংহতি জোরদার এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভাব।
৫. অর্থনৈতিক পরাশক্তি হিসেবে জাপানের বিশ্বব্যাপী প্রভাব বিস্তার এবং যুক্তরাষ্ট্র-জাপান বাণিজ্য যুদ্ধ।
৬. পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোট গঠন এবং আন্ত:বাণিজ্য ও সহযোগিতা জোরদারকরণ।
৭. আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রমে জাতিসংঘ সহ-আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বৃদ্ধি পাওয়া।
৮. বিশ্ব রাজনীতির পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের ভূমিকা হ্রাস পাওয়া।
৯. বিশ্বের দীর্ঘস্থায়ী সমস্যাগুলোর শান্তি স্থাপনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়া যেমন- মধ্যপ্রাচ্য, কম্বোডিয়া, নিকারাগুয়া, আফগানিস্তান, কোরিয়া)।
১০. ভারত, জাপান, ব্রাজিল ও জার্মানির সামরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি বৃদ্ধি এবং নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার প্রচেষ্টা গ্রহণ ইত্যাদি।

বর্তমান বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্র একক Super Power। সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায় ক্ষমতাবান যুক্তরাষ্ট্রের নিকট সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পরে আর কোন রাজনৈতিক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলো না, যারা বিশ্ব রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের বৈপরিত্য অবস্থান নিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে NATO জোটের সম্প্রসারণ ত্বরান্বিত হচ্ছে। বিশ্বের যে কোনো রাজনৈতিক ঘটনায় যুক্তরাষ্ট্র তার মনোভাব ব্যক্ত করে থাকে। এমনকি জাতিসংঘের মহাসচিব নির্বাচন সহ বিভিন্ন কাজ যুক্তরাষ্ট্রের অভিপ্রায় মোতাবেক সম্পন্ন হয়ে থাকে। যুক্তরাষ্ট্র অনেক সময়

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার অজুহাতে পুলিশি ভূমিকা পালন করে থাকে। সেক্ষেত্রে জাতিসংঘ ও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতামতের তোয়াক্কা করতে হয় না। এ সমস্ত অবস্থার মূল্যায়নে বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থাকে এককেন্দ্রিক বা এক মেরুভিত্তিক (Unilateral) বলা যেতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ইরাক আক্রমনের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী একক পরাশক্তি হিসেবে নিজের অবস্থান আরো নিশ্চিত করতে প্রয়াসী হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে চীন, রাশিয়া ও আমেরিকার একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র সামরিকভাবে চীন, জাপান, রাশিয়া ও ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের চেয়ে শক্তিশালী হলেও অর্থনৈতিক দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্র এই চার শক্তির নিকট প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীতার সম্মুখীন। জাপানের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যি ঘাটতির পরিমাণ ৭০ বিলিয়ন ডলার। জাপান যুক্তরাষ্ট্রকে পরাভূত করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর বাজার দখল করছে। বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতি জাপান, রাশিয়া এবং চীনের অর্থনীতির কাছে মার খাচ্ছে। সুতরাং অর্থনৈতিকভাবে বিশ্বে আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে জাপান, রাশিয়া ও চীনের শক্তির নিকট যুক্তরাষ্ট্রের সামর্থ্য চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। বর্তমান বিশ্বের সামরিক শক্তির চেয়ে অর্থনৈতিক শক্তির গুরুত্ব অনেক বেশি। পৃথিবীতে এখন যুদ্ধগ্রহের সম্ভাবনা অনেকাংশ হ্রাস পেয়েছে। অপরদিকে যুক্তরাষ্ট্র বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের নিকটও মারাত্মক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যি ঘাটতির পরিমাণ বর্তমানে ২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিকভাবে প্রভাব বিস্তার বজায় রাখার ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ইউনিয়নের চেয়ে পিছিয়ে রয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে অভিন্ন প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে ভবিষ্যতে বিশ্ব রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ তার হাতে চলে যেতে পারে। অপরদিকে জাপানও প্রয়োজনে পারমাণবিক বোমা তৈরিসহ সামরিক শক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে বিশ্বরাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে যা যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান একক ভূমিকার ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। এ অবস্থায় বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থাকে দ্বিমেরুকেন্দ্রিক (Bi-polar) বলা যায়।

বর্তমান আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় বিভিন্ন ধরনের উপ-আঞ্চলিক জোট গঠিত হচ্ছে। এই জোটগুলোও ভবিষ্যতে অভিন্ন প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের মাধ্যমে বিশ্বরাজনীতিতে ভূমিকা পালন করতে পারে। তাছাড়া চীনের মতো বৃহৎ শক্তির অধিকারী দেশ অর্থনৈতিক উন্নয়নে অভূতপূর্ব সাফল্যে ইতোমধ্যে বিশ্ব দরবারে হাজির হয়েছে নতুন অর্থনৈতিক দৈত্য হিসাবে। ১৯৯৭ সালের ১ জুলাই থেকে হংকং এবং ১৯৯৯ সালে ম্যাকাও চীনের আওতাধীন। ভবিষ্যতে তাইওয়ানও যে-কোন সময় চীনের নিয়ন্ত্রেণ চলে আসতে পারে। এক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক রাজনীতির নিয়ামক ভূমিকায় চীনের প্রতিদ্বন্দ্বী নাও থাকতে পারে। এ অবস্থায় বর্তমান পুরোপুরি বিশ্ব ব্যবস্থা অদূর ভবিষ্যতে পরিবর্তিত হয়ে তিন মেরুভিত্তিক (Tri-Plar) হতে পারে।

বর্তমান বিশ্বে জাতিসংঘের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে একাধিক সদস্য রাষ্ট্র স্থায়ী সদস্যপদ লাভ করতে চাচ্ছে। ভারত, ব্রাজিল, জার্মানি ও জাপান তাদের শক্তি ও সামর্থের মাপকাঠিতে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য পদ দাবি করছে। এসকল রাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য পদ লাভ করলে সেক্ষেত্রে বিশ্ব রাজনীতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের ভূমিকা মুখ্য হতে পারে। তাছাড়া পৃথিবীর উন্নয়নশীল দেশগুলোর অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের জন্য যে কোন দ্বিপাক্ষিক (Bilateral) সহযোগিতার চেয়ে আন্তর্জাতিক সংস্থার সাহায্য ও সহযোগিতা অনেক বেশি কার্যকর। আপাতত যুক্তরাষ্ট্রকে পৃথিবীর একক শক্তি হিসেবে মনে করা হলেও বাস্তবে যুক্তরাষ্ট্র এককভাবে সকলক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করতে সক্ষম হচ্ছে না। উদাহরণস্বরূপ কুয়েত সংকটের সময় ইরাকের সাথে যুদ্ধের কথা উল্লেখ করা যায়। এ যুদ্ধে জাপান আর্থিক সাহায্য প্রদান না করলে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য হয়তো আরেক ভিয়েতনামী পরাজয় নির্ধারিত ছিলো। সার্বিক বিচেনায় বর্তমান বিশ্বব্যবস্থাকে মূলত বহুকেন্দ্রিক (Multipolar) বলা যেতে পারে, সেক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব আধিক্য আপাতত কিছুটা বেশি।